মানুষ ও দেবতা

নসীম হিজাযী

www.priyoboi.com

এক

শ্রাবণ মাস। সুরমা নদীতে প্রবলস্রোত। নদীর কিনারায় কয়েকটি ছোট নৌকা তীরবর্তী বড় বড় পাথরের সঙ্গে বাঁধা আছে। বেগবতী নদীর স্রোতে নৌকাগুলো দুলছে। নিকটেই নদীতীরে কয়েকজন মাঝি নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলাবলি করছে। একজন বুড়ো মাঝি কপালে হাত রেখে বিশাল নদীর অপর তীরের দিকে একবার দেখে পিছন ফিরে জনৈক সুদর্শন যুবককে জিজ্ঞেস করল, 'মহারাজ! সেনাপতিজী কি আজই আসবেন?'

সামরিক পোশাক পরিহিত সুদর্শন যুবককে একজন অফিসার মনে হচ্ছিল। সে জবাবে বলল, "হ্যাঁ, তিনি সম্ভবত এখনই এসে যাবেন।"

বুড়ো মাঝি বলল, "মহারাজ! আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন, এ খরস্রোতা নদীতে নৌকা চালানো খুবই বিপজ্জনক। দুদিন অপেক্ষা করলেই ঢলের জল কমে যাবে। আর তখন নিরাপদে পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে।"

যুবক বলল, "তুমি সেনাপতি সুখদেবকে জান না। তিনি কখনও সামান্য বিপদ আপদের ভয়ে মত পরিবর্তন করেন না।"

যুবকের নাম রামদাস। বয়স চব্বিশ বছর হলেও তাকে দেখতে আঠারো বছরের ছেলেমানুষ মনে হচ্ছে। হাসিহাসি মুখ এবং আকর্ষণীয় দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী রামদাস খুবই মিষ্টভাষী। সে বুড়ো মাঝিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এঘাট থেকে কখনও নদী পাড়ি দাও নি?"

বুড়ো বলল, "মহারাজ! আমাদের বাপ-দাদাও এঘাটে কখনো আসেনি।"

বুড়ো মাঝি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। একজন মাঝি চেঁচিয়ে বলল, "সেনাপতিজী এসেগেছেন।"

রামদাস ও বুড়ো মাঝি ফিরে দাঁড়াল। মহারাজার সেনাপতি সুখদেব একটি ছাই

রংয়ের সুন্দর ঘোড়ায় চড়ে এসে পৌঁছুল। তাঁর পেছনে প্রায় চারশো পদাতিক সৈন্য দু'সারিতে ভর্তি হয়ে পায়ে হেঁটে চলে এলো।

সুখদেব নিকটে এসে ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। বুড়ো মাঝিও সঙ্গে সেনাপতিকে প্রণাম করল।

সুখদেব মাঝিদের সরদারকে ডাকলো। বুড়ো মাঝি ঘোড়ার বাগ অন্য একজন মাঝিকে ধরতে দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে সেনাপতিকে দূর থেকেই প্রণাম করল। সুখদেবের প্রশ্নের জবাবে মাঝি জানাল, ঘাটে সাতটি নৌকা আছে। তবে একটি নৌকা জলের নীচে লুকোনো পাথরের ধাক্কায় কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতি নৌকায় চল্লিশ জন করে সৈনিক যেতে পারবে। বুড়ো মাঝি আরও বলল, নদী খুব খরস্রোতা। ওপারে একটি মাত্র সংকীর্ণ ঘাটে নৌকা ভিড়ানো যায়। তাছাড়া এদিক-ওদিকে বড় বড় পাথর রয়েছে। এখন ঢলের প্লাবনে ঘাট-অঘাট ঠিক করাই দায়। স্রোতের ধাক্কায় যদি নৌকা ঘাট ছাড়িয়ে যায়, তাহলে পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যাবার আশংকা। বুড়ো মাঝি তাই দু'তিনদিন পর প্লাবন কমে গেলে পাড়ি দেবার অনুরোধ জানাল।

সুখদেব সেনাপতির পদে পদোন্নতি লাভ করেছিল মাত্র বিশ দিন আগে। নদীর ওপারে পাহাড়ী এলাকার অচ্ছুৎদের শায়েস্তা করার জন্য মহারাজ তাকে মাত্র বিশ দিনের সময় দিয়েছেন। নদীতীরে পৌঁছতে পৌঁছতেই তার দু'দিন কেটে গেছে। তাই তার পক্ষে বিলম্ব করা চলে না। রাজদরবারে তার প্রতিদ্বন্দ্বী গঙ্গারাম সেনাপতির পদ না পেয়ে খুবই কুপিত। সুখদেব নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সমাধা করতে অসমর্থ হলে গঙ্গারাম মহারাজার নিকট সুখদেবের অযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য অতি মাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠবে। সুখদেব তাই বুড়ো মাঝিকে বলল, "না, আমার তো বিলম্ব করার যো নেই। আজই নদী পাড়ি দিতে হবে।"

বুড়ো মাঝি করজোড়ে বলল, 'মহারাজ! আমাদের জন্য নয়। আমরা কয় পয়সা দামের মানুষ! আপনার এবং দেবতাদের সৈনিকগণের জীবন অতি মূল্যবান। আপনাদের সকলের মঙ্গল চিন্তা করেই আমি দু'দিন অপেক্ষা করার জন্য আবেদন করছি। এ সময়ে নদী পাড়ি দেয়া খুবই বিপজ্জনক। রাজপুরুষেরা অতীতে শুধু শীতকালেই নদীতে পাড়ি দিতেন।"

সুখদেব ধমকের সুরে বলল, "তুমি বেশী কথা বলছ মাঝি! ওপারের বন্য লোকগুলি শীতকালে আমাদের আক্রমণের ভয়ে সতর্ক থাকে। একটু টের পেলেই খরস্রোতের মত ছুটে গভীর জংগলে পালিয়ে যায়। বর্ষাকালে এরা আক্রমণের আশংকা করে না। তাই অসতর্ক থাকে। এসময় ওখানে পৌঁছে ওদের সকলকেই গ্রেফতার করা সহজ হবে। আমি আর কোন কথা শুনতে চাইনে। পাড়ি দেবার জন্য তৈরী হয়ে যাও।"

বুড়ো মাঝি বলল, "মহারাজ! আপনার হুকুম মেনে চলাই আমাদের কাজ। যদি অনুমতি দেন তবে একটি নিবেদন আছে। বুড়ো মানুষের একটি কথা শুনলে আপনার ক্ষতি হবে না।"

সুখদেব অনুমতি দিলে বুড়ো মাঝি বলল, "মহারাজ! সকলে এক সঙ্গে পাড়ি না দিয়ে একটি নৌকায় বিশ জন সৈন্যকে প্রথমে যেতে দিন। যারা ভাল সাঁতার কাটতে জানে, তাদেরই প্রথম দফা যেতে দিলে ভাল হয়। যদি দেবতাদের ইচ্ছায় নৌকাটি মঙ্গল মত ওপারে পৌছে যায়, তাহলে অন্য নৌকাগুলি সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে পাড়ি দেবে।"

সুখদেব বুড়ো মাঝির এ প্রস্তাব পছন্দ করল। সে রামদাসকে হুকুম দিলো, "বিশজন ভাল ভাল সিপাই বাছাই কর। তারা আমার সঙ্গে প্রথম নৌকায় যাবে। আমি ওপারে পৌছে যাবার পর তুমি সকলকে নিয়ে একসঙ্গে পাড়ি দেবে।"

রামদাস একটু আপত্তি জানিয়ে বলল যে, প্রথম সেনাপতিজীর যাওয়া ঠিক হবে না। দৈবচক্রে কোন দুর্ঘটনা হয়ে গেলে, সেনাপতিরই জীবন নাশ হবার আশংকা। সেনাপতির পরিবর্তে প্রথম নৌকায় রামদাস নিজেই যাবার অনুমতি চাইল।

সুখদেব দৃঢ়স্বরে বলল, "না, রামদাস! প্রথম নৌকায় আমি যাব। যদি দুর্ঘটনায় আমি মারা যাই, তাহলে গঙ্গারাম আমাকে অনভিজ্ঞ বলতে পারবে, কিন্তু কাপুরুষ বলতে পারবেনা।"

সুখদেব কুড়িজন বাছাই করা সৈন্যসহ নৌকায় উঠলে বুড়ো মাঝি তিনজন সহকারী নিয়ে নোঙর তুলে দিল। প্রবল স্রোতের মুখে নৌকার লক্ষ্য ঠিক রাখাই অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠল। স্রোতের টানে নৌকা অন্যদিকে চলে যেতে লাগল। মাঝিগণ গলদঘর্ম্ম হয়ে মাঝ নদী পর্যন্ত পৌছুল। সেখানে স্রোতের বেগ আরও বেশী। বৈঠা টেনে টেনে মাঝিদের হাত পা অসাড় হয়ে এসেছিল। মাঝ নদীর বেগবান স্রোতের মুখে তারা কিছুতেই নৌকা ঘাটমুখী করতে পারল না। মাঝিদের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে নৌকা স্রোতের টানে ভাটির দিকে যেতে শুরু করল। বুড়ো মাঝি হাঁক ডাক করে তার সঙ্গীদের নানা নির্দেশ দিচ্ছিল। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও নৌকাটি পানির নীচে লুকোনো একটা বিশাল পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেল। সঙ্গে সঙ্গে নৌকার তলা ফেটে পানি উঠতে শুরু করল। মাঝি ও সৈনিকগণ চীৎকার ও হৈ চৈ করে নদীর মধ্যে পড়ে গেল। স্রোতের টানে কে কোথায় গেল, তার কোন হদিস রইল না। সুখদেব ভাল সাঁতার কাটতে জানতো। বেশ কিছু সময় সাঁতার কাটার পর তার হাত পা অবশ হয়ে এলো। বাধ্য হয়েই নিজেকে সে স্রোতের মধ্যে ছেড়ে দিল।

দুই

সুখদেবের জ্ঞান ফিরে এলে সে কতকগুলো অপরিচিত গলার স্বর শুনতে পেলো। চোখ খুলে তার চারদিকে কয়েকজন অপরিচিত মানুষ দেখতে পেয়ে পুনরায় সে চোখ বন্ধ করল। মুহূর্তের মধ্যে আগের ঘটনাবলী তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে তার প্রশ্ন জাগল, "আমি কি সত্যি বেঁচে আছি?" ভাবতেই তার চোখের পাতা খুলে গেল। অসহায় দৃষ্টিতে সে অপরিচিত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

কয়েকটি মুহূর্ত অতিক্রান্ত হতেই সুখদেব অনুভব করল, যাদের সে হত্যা ও বন্দী করার জন্য এসেছিল, তাদেরই মাঝখানে এখন সে নেহায়েত অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় শুয়ে রয়েছে। আরও অবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে, এই লোকগুলোর চেহারায় ঘৃণা বা আক্রোশের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। উপরন্তু তার প্রতি তাদের সমবেদনার মনোভাবই দেখা যাচ্ছে। তার 'ন্যায়-পরায়ণ' মহারাজা ও পুরোহিত ঠাকুর এ লোকগুলোর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ জারী করেছিলেন। তাদের ফসলভরা ক্ষেতগুলো থেকে বিতাড়িত করার জন্যই ছিল তার এ অভিযান। এ লোকদের মুখ দেখা, এদের সঙ্গে বাক্যালাপ করা, এদের গলার স্বর শোনা কিংবা এদেরকে স্পর্শ করাও জঘন্যতম পাপ। সমাজের আইন এদেরকে অচ্ছূৎ ঘোষণা করেছে। অচ্ছুৎদের প্রতি অত্যাচার করা বর্ণ হিন্দুদের জন্মগত অধিকার।

আজ সুখদেব তাদেরই দয়ার উপর নির্ভরশীল। একটি জীর্ণ কুটিরে ময়লা পুরাতন ছিন্ন বিছানায় সে শুয়ে আছে। সে তাদের গলার আওয়াজ শুনেছে, তাদের চেহারা দেখেছে এবং তাদের ছোঁয়া বিছানায় শয়ন করেছে। ধর্মচ্যুত হতে তার আর কিছুই বাকী নেই। সমাজের ভয়ে সুখদেবের অন্তর কেঁপে উঠল। অথচ এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাবার তার শক্তি নাই। চারদিকের লোকগুলো তার সম্পর্কে নানা কথা বলাবলি করছে। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি যুবক ছুটে এস বলল, "রাস্তা পরিষ্কার কর। সরদারআসছে।"

নির্দেশ পাওয়া মাত্র লোকগুলো কুটিরের এককোণে চলে গেল। একজন বুড়ো লোক লাঠি ভর করে কুটিরে এসে প্রবেশ করল। তার সঙ্গে ছিল একটি লম্বাচড়া সুন্দরী যুবতী। বুড়ো সরদার সুখদেবের নিকট বসে তাকে মনোযোগ সহকারে দেখল। সুখদেব ঘৃণাভরে অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

সরদার জিজ্ঞেস করল, "আপনার পরিচয়?"

সুখদেব অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়েই রেখেছিল। কোন জবাব দিল না।

সরদার আবার বলল, "আপনাকে দেখে তো বেশ উচুঁ-জাতের সৈনিক মনে হয়।

আপনি এখানে কি করে এলেন?"

সুখদেব নীরব থাকায় অন্য একজন বলল, "মহারাজ! ইনি নদীতে ডুবে যাচ্ছিলেন। আমরা অনেক কষ্টে তাকে তুলে এনেছি।"

সরদার বললো, "খুব ভাল করেছ।"

সরদার আবার সুখদেবকে লক্ষ্য করে বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। কাল সকাল পর্যন্ত আপনি সুস্থ হয়ে যাবেন। নদীর জল নেমে গেলেই আমরা আপনাকে ওপারে পাঠিয়ে দেব।"

সুখদেবের চিন্তাক্লিষ্ট চেহারায় এবার স্বস্তির আভাস ফুটে উঠল। সে ভাবল, এতদিন যাবৎ এদের নিষ্ঠুর ও অমানুষিক আচরণের যে হাজার হাজার কাহিনী শুনে এসেছি, তা কি তাহলে মিথ্যা? শৈশব থেকেই সে শুনে এসেছে, বুনো অচ্ছুৎগোষ্ঠী মানবতা বর্জিত। দয়ামায়ার কোন লেশ মাত্র নেই ওদের প্রাণে। বর্ণ-হিন্দুকে পেলেই ইতর প্রাণীর মত ওরা হত্যা করে। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! সরদারের কথাগুলোর মধ্যে কেমন মমত্ববোধ ফুটে উঠেছে। সুখদেবের মনে আর একটি চিন্তা জেগে উঠল। হয়ত বা এরা তাকে হত্যা করার জন্যই তার মনে বেঁচে থাকার আশা জাগিয়ে তুলতে চাইছে। সুখদেব সকলের মুখের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে যখন যুবতীর দিকে তাকাল, তখন তার দৃষ্টি সেখানেই স্থির হয়ে রইল।

অপবিত্র, দরিদ্র ও সহায়-সম্বলহীন সমাজে পরীর মতন এ মেয়েটি জন্মাল কী করে? তার পরিধানের কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মুখমন্ডলে উষার রক্তিম আলোর ঝলক। যুবতীর আকর্ষণীয় চেহারায় সরলতা, বুদ্ধিমত্তা ও গাম্ভীর্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন দীপ্যমান। মজবুত ও সুগঠিত দেহে নারীসুলভ সকল লাবণ্য ফুটে আছে। যুবতীর চেহারাখানা তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে অন্তরে যেন তীর নিক্ষেপ করল। সুখদেব তার অন্তরের অন্তঃস্থলে সুমধুর সুর-লহরী শুনতে পেল। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল, সে পবিত্র সমাজের সন্তান। আর যে সুন্দরী কুমারীর দিকে সে তাকিয়ে আছে, সে অচ্ছুৎ সমাজের এক অপবিত্র যুবতী। সুখদেব তাড়াতাড়ি অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।

সরদার বলল, "এমন ঢলের সময় আপনি নদীতে নাবতে গেলেন কেন? বোধহয় ভাল সাঁতার কাটতে পারেন। তা না হলে উঁচু জাতের লোকেরা তো সাধারণত এ মওসুমে নদী থেকে দুরেই থাকে।"

সুখদেব বুড়ো সরদারের দিকে তাকাল। মন বলছে। বুড়োর সঙ্গে তার আলাপ করা উচিত। কিন্তু মুখে তার ভাষা যোগাচ্ছে না। সরদার স্নেহ ভরা স্বরে বলল, "আপনি এত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? সাহস সঞ্চয় করুন। এখানে আপনার কোন দুশমন নেই। আপনার মহারাজার সৈনিকেরা আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে আমাদের সহায় সম্পদ লুন্ঠন করে আমাদেরকে গোলাম বানানোর উদ্দেশ্যে এখানে শুভাগমন করেছে। সেসব তো অনেক দিন আগের কথা। এখন আপনিই প্রথম অতিথি হিসাবে আমাদের এখানে আপনার পবিত্র চরণ রেখেছেন। যদিও আপনার উপযুক্ত সেবাযত্ন করার মত শক্তি

আমাদের নেই, তবু আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার চরণের সেবা করার জন্য আমরা আমাদের সবকিছু লুটিয়ে দিতে কোনই ত্রুটি করব না।"

সরদার উপস্থিত লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যা' যা' বললাম, তা তোমরা সত্য বলে প্রমাণিত করবে– এটাই আমি আশা করি।"

একথা বলে সরদার এগিয়ে গিয়ে সুখদেবের পা ছুঁয়ে প্রনাম করল। সুখদেব আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করছিল, সরদার তাকে "তুমি" না বলে "আপনি" সম্বোধন করছে। সে তার অন্তরে একটা ভারী বোঝার চাপ অনুভব করতে লাগল। তার মনে হল, এ কুটিরের প্রতিটি শুক্‌নো পাতা তাকে ঘৃণার চোখে দেখছে। ইচ্ছা হচ্ছে ছুটে গিয়ে নদীতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু শরীরে শক্তি নেই। সুখদেব চঞ্চল হয়ে উঠে বসল। সরদারের দেখাদেখি উপস্থিত সকলেই একের পর এক সুখদেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। কিন্তু তাদের হাতের ছোঁয়া সুখদেবের নিকট জ্বলন্ত অঙ্গার হল। তার বিবেক বলে উঠল, "হায়! এ বুড়ো সরদার যদি আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করার পরিবর্তে খঞ্জরের খোঁচায় আমাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবার জন্য তার লোকদের হুকুম দিত, তাহলেই অনেক ভাল হ'ত।"

সকলের পর সরদার যুবতীকে লক্ষ্য করে বলল, 'মা কমল! কী চিন্তা করছ? অতিথির সম্মান করা আমাদের সব চেয়ে বড় কর্তব্য।"

যুবতী সসংকোচে উঠে দাঁড়াল। লজ্জা, সংকোচে ও ভয় মেশানো এক অদ্ভুত হাসি হেসে সে সুখদেবের দিকে তাকাল এবং নতজানু হয়ে তার পায়ে হাত রাখল। প্রণাম শেষ করে আবার ধীরে ধীরে পিছু হটে তার পিতার কাছে গিয়ে দাড়াল। মুহূর্ত কালের জন্য তার সারা দেহের রক্ত যেন মুখ মন্ডলে জমা হয়ে গিয়েছিল। মুখে তার সাদা ও লাল আভা প্রস্ফুটিত হতে লাগল। সুখদেবের হৃদয় থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল। কিন্তু তবু সমাজের এই উচ্চশ্রেণীর আত্মগর্বী যুবক নিজের মনের দুর্লতা বাইরে প্রকাশ পেতে দিল না।

সরদার তার লোকজনকে সেখান থেকে চলে যেতে আদেশ দিল। মাত্র অল্প কয়েকজনকে রাত জেগে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে সুখদেবকে বলল, "আপনি রাজ–প্রাসাদের বাসিন্দা। আমাদের এসব জীর্ণ কুটিরে অবশ্যই আপনার কষ্ট হবে। অনুমতি দিলে আপনার খাটিয়াটি বাইরে নিয়ে যেতে পারি। মেঘ কেটে গেছে। বাইরে ঠান্ডা হাওয়ায় আপনি আরামে ঘুমুতে পারবেন।"

সুখদেব বাইরে চলে গেলে একজন লোক তার খাটিয়াটি সাজিয়ে দিয়ে গেল। সরদার বলল, "আপনি বিশ্রাম করুন। আমার এ লোকেরা আপনার সেবাযত্নের জন্য এখানে রইল। আমি এখন যাচ্ছি। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে দয়া করে আমার এ লোকদেরকাছেবলবেন।"

সরদার কিছুদূর চলে গেলে সুখদেব তাকে ডেকে বলল, "সরদারজী। আমার চারধারে এসব লোক পাহারায় দাঁড়িয়ে থাকলে আমি তো ঘুমুতে পারব না। আপনাকে

নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমি পালাতে চেষ্টা করব না। আমাকে এখন একা থাকতে দিলে ভাল হয়।"

সরদার ফিরে এসে বলল, "আপনি যদি চলে যেতে চান, তাহলে কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। নদীতে ঢল না এলে আমি নিজে আপনাকে ওপারে পৌঁছে দিতাম। আপনি কেন ভাবছেন যে, আপনি আমাদের কয়েদী? আপনি শহরের বাসিন্দা। এ বন জংগলে একাকী আপনি অস্বস্তি বোধ করতে পারেন মনে করে আমি ওদের পাহারায় লাগিয়েছি।"

সুখদেব বললেন, "না না, পাহারার দরকার নেই। দয়া করে আপনি ওদের চলে যাবার হুকুম দিন।"

সরদারের নির্দেশ পেয়ে বাকীরাও সবাই চলে গেল। সরদার বলল, "আপনি হুকুম দিলেই ওরা চলে যেতো। ওদেরও অতিথি সেবার যথেষ্ট আগ্রহ। তাছাড়া আপনার মত অতিথির চরণ সেবার সুযোগ তো সহজে আসে না।" সরদার একথা কয়টি বলে নিজেও বাড়ীর দিকে রওনা হল।

তিন

সরদারের নাম সাধন। তার এলাকার সামান্য কিছু অংশ সমতল ভূমি এবং বেশীর ভাগই পাহাড়। এ অঞ্চলে কয়েকটি পাহাড়ী গোত্রের বাসস্থান। পূর্বে তারা সিলেটের সমতল এলাকায় বাস করত। উত্তর ভারত থেকে আগত আর্যগণ বারবার আক্রমণ চালিয়ে তাদের জমিজমা কেড়ে নিয়ে পাহাড় ও জংগলে তাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, আর্যগণ দেশের আদিম বাসিন্দাদের অচ্ছুতও ঘোষণা করে। যে হতভাগ্য লোকেরা বশ্যতা স্বীকার করেছিল, তাদের শূদ্র আখ্যা দিয়ে সমাজের ঘৃণ্য দাসে পরিণত করা হয়। যারা এ দাসত্বের জীবন মেনে নিতে রাজী হয়নি, তারা জৈন্তিয়া থেকে আসামের শেষ সীমায় পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যায়। এ পাহাড়ী ও সমতল এলাকার মিলন স্থলেই বর্ণ হিন্দুদের রাজত্ব ছিল। তারা ঐ পাহাড়ী এলাকায় আক্রমণ করে অচ্ছুৎদের এলাকা দখল করে তাদের উপর দাসত্বের জীবন চাপিয়ে দিতে খুবই উৎসাহী হয়ে ওঠে। যে রাজা বেশী পরিমাণ পাহাড়ী এলাকা দখল করতে পারতো, তারই তত বেশী বীরত্ব প্রমাণিত হত। বর্ণ হিন্দুগণ ঐ রাজাকে সন্মান ও সম্ভ্রমের নজরে দেখত।

সাধন এই রকমই এক পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী কয়েকটি গোত্রের সরদার। পাহাড়ী এলাকায় এদের স্বাধীন জীবন যাপন পার্শ্ববর্তী মহারাজার জন্য মাথা ব্যথার

কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই সাধনদেরকে শূদ্র বানিয়ে নেবার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত নেই।

পাহাড়ী লোকেরা তথাকথিত উঁচু জাতের লোকদের কোন ক্ষতি করে না। তারা বর্ণ হিন্দুদের রাজ্যে প্রবেশও করে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও বর্ণ হিন্দু রাজাগণ তাদের স্বাধীন জীবন যাপন মোটেই পছন্দ করে না। পাহাড়ের সবুজ বনাঞ্চলে গো-মহিষাদি প্রতিপালন, আসমানের রোদ-বৃষ্টি ও মাটির উর্বরতা থেকে ফসল উৎপাদন করে নীচ জাতের লোকেরা কেন সুখে জীবন যাপন করবে? এরা দেবতাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য জীব। গোলামী করার জন্যই এদের জন্ম। আসমানের রোদ-বৃষ্টি, উর্বর ভূমি ও গৃহপালিত জীবজন্তু ভোগ করার একচ্ছত্র ইজারাদারী হচ্ছে উঁচু জাতের লোকদের। তাই তারা এদের প্রতি সর্ব প্রকার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণকে শুধু বৈধই মনে করে না, দেবদত্ত অধিকার বলেই বিবেচনা করে।

প্রতিবেশী রাজা এ পাহাড়ী এলাকা দখল করার জন্য বারবার আক্রমণ করেছে। কিন্তু ঘন জংগল এবং খাড়া পাহাড় বারবার তাদের অভিযান ব্যর্থ করে দিয়েছে। তাই দশ বারো বছর যাবত মহারাজা পাহাড়ী এলাকায় কোন সৈন্য প্রেরণ করেনি। সাধন ও তার সমগোত্রীয় লোকেরা এই কয়েকটি বছর নিরূপদ্রবে কাটিয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্যে এক যুবক রাজা সিংহাসনে বসার পর বুড়ো পুরোহিত তাকে অচ্ছুৎ নিধনের "পবিত্র" কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেয়। মহারাজাও দেবতাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে সুখদেবের নেতৃত্বে শূদ্রদের অপবিত্র অঞ্চল দখল করার জন্য সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। যাবার পথে অচ্ছুৎদেরই দয়ায় বিস্ময়কর ভাবে সুখদেবের জীবন রক্ষা পায়।

সরদার নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে অতিথি সম্পর্কে চিন্তা করছে, ঠিক এমনি সময় তার স্নেহের কন্যা কমল জিজ্ঞেস করল, "বাবা, আজ তোমাকে এমন চিন্তিত মনে হচ্ছে কেন? কিছু খাচ্ছনা! খাবার নিয়ে আসব?

সাধন বলল, "না মা, খিধে নেই। এখন কিছুই খাব না।

কমল বলল, "আচ্ছা, বাবা! অতিথির তো খিদে পেয়েছে। তুমি তাকে কিছু খেতে বলছ না কেন?"

সরদার বলল, "মা! ওঁরা তো উঁচু জাতের লোক। আমাদের হাতের কোন কিছুই তারা খান না।"

"কেন, বাবা, খান না কেন?"

"তুমি জানো না মা, তাদের ধর্মই এটা নিষেধ করেছে। নিরূপায় না হলে অতিথি আমাদের খাটিয়াতেও শুতেন না।"

"নিরূপায় হয়ে যদি আমাদের খাটে শু'তে পারেন, তাহলে নিরূপায় হয়ে আমাদের খাবারও তো খেতে পারেন।"

"অতিথি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন এই ভয়ে আমি তাকে খেতে বলিনি মা।"

"এমনও তো হতে পারে, অতিথি খুব ক্ষুধার্ত, তাকে খেতে দিলে তিনি আরো সন্তুষ্টইহবেন।"

"মা, আমাদের খাবার খেলে যে অতিথির ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। অতিথিকে ধর্মভ্রষ্ট করা মহা পাপ। তাই তিনি ক্ষুধার্ত হলেও আমি তাকে আমাদের ঘরে খেতে বলতে পারিনা।"

"যদি তিনি নিজে চেয়ে খান?"

"তাহলে তো আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি কি কখনও চাইবেন ভাবছ, কমল?"

"বাবা! তিনি যতদিন আমাদের অতিথি থাকবেন, ততদিনই কি না খেয়ে কাটাবেন?"

"কমল! তুমি তা নিয়ে এত ভাবছ কেন? কাল সকালেই আমি তাকে নদীর ওপারে পৌঁছে দিয়ে আসব। তুমি এখন যাও, ঘুমোও গিয়ে।"

কমল নিরাশ হয়ে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু চোখে তার কিছুতেই ঘুম এলো না। নারী স্বভাবতই মমতাময়ী। সুখদেব ক্ষুধার্ত, নিরূপায় এবং বিপদগ্রস্ত। ঘরে খাবার আছে, অতিথির পেটে ক্ষুধা আছে অথচ তিনি খাবেন না। তাঁর ধর্ম তাঁকে অন্য মানুষের হাতের খাদ্য খেতে নিষেধ করে দিয়েছে। কতদিন তিনি ধর্মের নির্দেশ মান্য করে উপবাস করবেন? তাকে উপবাস করতে দেয়াটাই কি ধর্ম?

সরদার ঘুমিয়ে পড়বার পর কমল উঠে গিয়ে একটি টুক্‌রী থেকে অনেকগুলো ভাল ভাল আম তুলে আনল। তারপর সুখদেব যে বাড়ীতে বিশ্রাম করছিল, সেখানে গিয়ে হাজির হল। সুখদেব খাটিয়ায় ছিল না। আমগুলো তার বিছানার ওপর রেখে কমল ফিরে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেল সুখদেব তার ফেরার পথ ধরেই হেঁটে আসছে। কমলের বুক দুরু দুরু করতে লাগল। সে পথের এক পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুখদেব নিকটে এসে কমলকে দেখে বিস্মিত হল। কিন্তু সে কমলের সঙ্গে কোন কথা না বলে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। বিছানার ওপর আমের স্তূপ দেখে সে অবাক হল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর সে কমলকে লক্ষ্য করে বলল, "তুমি এত কষ্ট করেছ কেন?"

কমল এক কদম সামনে এসে বলল, 'আপনি অসন্তুষ্ট হতে পারেন ভয়ে আমার বাবা আপনাকে খাবার জন্য অনুরোধ করেননি। আবার তিনি নিজেও খাওয়া দাওয়া করেননি। আমি তাই ভেবেই আপনার জন্য এগুলো নিয়ে এসেছি। এগুলো গাছের ফল। আপনি অনুমতি দিলে আমি রুটি আর দুধও নিয়ে আসতে পারি।"

সুখদেব ভাবল, এই সরলা যুবতীর মুখ থেকে যে কথাগুলো বের হল, তা আশ্চর্য্য রকম দরদ ও মানবতাবোধে পরিপূর্ণ। তার কথায় কোথাও কোন কপটতা নেই। কমলের মুখের উচ্চারিত শব্দগুলো তাই তার অন্তরে তীরের মত বিঁধে গেল। জবাবে সে শুধু বলল, "না, না, দুধ-রুটির কোনই দরকার নেই। তুমি ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।"

কমল অনুরোধ করে বলল, "আপনি আমগুলো খেয়ে নিন। গাছের ফল খেতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আগামী কাল হয়ত নদী পাড়ি দেয়া সম্ভব হবে না। কতদিন এখানে থাকতে হয় তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। আপনি এত সময়

উপোস করে থাকবেন, সেটা হয় না।

সুখদেব এবার ভাল করে কমলের দিকে তাকাল। কমলের চোখ দু'টো যেন নীরব ভাষায় বলছিল "সুখদেব! তুমি উপোস করে রয়েছ। সেজন্যই আমি খাবার নিয়ে এসেছি।" সুখদেব অনুভব করল, "অচ্ছূৎ সমাজের এ সরলপ্রাণা বালিকা তাকে উচ্চবংশের লোক বিবেচনা করে পূজা করতে আসেনি। বরং তার দুর্দশা দেখে সাহায্য করতে এসেছে। সুখদেব কিছু না বলে আমগুলো একপাশে সরিয়ে দিয়ে খাটিয়ায় বসে পড়ল। কমলও নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল।

সুখদেব কিছুক্ষণ ধরে আমগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। নীচ জাতের যুবতীর হাত লাগা সত্ত্বেও সেগুলো থেকে সুগন্ধই বের হয়ে আসছে। আমের রক্তাভ বর্ণ এবং সুগন্ধ তার ক্ষুধা যেন আরও বাড়িয়ে দিল। একটি আম উঠিয়ে সে মুখের কাছে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখে সমাজের কঠোর চেহারা ভেসে উঠল। ভয়ে ভীত হয়ে আমটিকে সে পুনরায় আগের জায়গায় রেখে দিল।

চার

কমল চলে গেলে সুখদেব আমের পুঁটুলিটি উঠিয়ে নিয়ে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করল। সে একজন সাহসী সৈনিক। তীর ও তরবারীর ছায়ায় তার জীবন গড়ে উঠেছে। দেবতাদের দুশমন এ নীচ জাতের মানুষদের নির্বিচারে হত্যা করে তাদের রক্তে হোলি খেলার মনোবল তার ছিল। কিন্তু আজ এক অচ্ছূৎ যুবতীর দয়ার্দ্র হৃদয়ের উপঢৌকন সে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সাহস পেল না। নদীর কিনারায় পৌঁছে সুখদেব একটি পাথরের ওপর বসেপড়ল।

তার বিবেক বলল, "তোমার অন্তরে দুর্বলতা প্রবেশ করেছে। তা না হলে ছোট জাতের একটি সামান্য বালিকার উপহার তুমি ফিরিয়ে দিতে পারছ না কেন? তুমি একদিকে দেবতাদেরও খুশী করতে চাও, আবার দেবতাদের দুশমন ঘৃণ্য শূদ্রদের মনেও কষ্ট দিতে রাজী নও। তুমি দুদিক রক্ষা করবে কি করে? যাদের হত্যা করতে এবং যাদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে ধ্বংস করতে তুমি এসেছিলে, তাদের মানবোচিত ব্যবহার, ভদ্রতা ও সেবায় তুমি লজ্জিত হয়েছ। অথচ বংশ গৌরবের দরুন তুমি তা স্বীকার করছ না। আমগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সমাজে ফিরে গেলেই কি তোমার পূর্ব-মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে? তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত আজ অপবিত্র হয়ে পড়েছে। তুমি এতদিন সমাজ নামক একটা শেকলের শক্ত আংটি ছিলে। কিন্তু আজ তোমার সে

অবস্থা আর নেই। মহারাজা ও পূজারী ঠাকুরের নির্দেশে এখন তুমি আর নির্বিচারে ছোট জাতের মানুষগুলোর রক্তপাত করতে পারবে না। শূদ্রদের মানুষ বিবেচনা করে তোমার অন্তর অপবিত্র হয়ে গেছে। তুমি তাদের ঘাড়ে তরবারীর আঘাত করতে গিয়ে একশো বার চিন্তা করতে বাধ্য হবে। নীচ জাতের বুড়ো সরদার ও সরল প্রাণা একটি কুমারী নারীর কথা তোমার হৃদয়কে নরম করে ফেলেছে। তুমি তাদের প্রতি আর কখনই নিষ্ঠুর হ'তে পারবে না। বরং নিষ্ঠুর আচরণের নির্দেশ পেলে তোমার মনই বিদ্রোহ করেউঠবে।"

বিদ্রোহের কথা মনে উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুখদেব ভয়ে কেঁপে উঠল। সে অনুভব করল, এটা পাপ চিন্তা। এক অজানা শক্তি যেন তাকে দেবতাদের পবিত্র চরণ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দূর পাহাড়ের হতভাগ্য শূদ্ররা ছুটে এসে যেন তার চারপাশে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো সরদার ও তার যুবতী কন্যা এগিয়ে এসে সুখদেবের হাত ধরে বলছে, "বল, আমাদের কি অপরাধ? তোমরা আমাদের কি জন্য ঘৃণা কর? তোমরা কি কারণে আমাদের রক্ত পান করতে চাও?" সুখদেবের মনে হল সে যেন হাজার হাজার নির্যাতিত মানুষের মাঝখানে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তার বিবেকের এক কোণ থেকে আওয়াজ উঠল, "সুখদেব সাবধান! তুমি ধর্মচ্যুত হয়ে যাচ্ছ। ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তোমার মন শক্ত কর।"

সুখদেব নিজের মনের দুর্বলতা দূর করার জন্য আপনমনে বলে উঠল। "না না, ছোট-জাতের লোকদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। দেবতা তাদের বর্জন করেছে। তাদের প্রতি দরদ দেখানো মহাপাপ।"

তার মনে সাহস ফিরে এল। সে মনে করল, দূরে নদীর উপর দিয়ে হেঁটে দেবতা তাকে যেন উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য এগিয়ে আসছে। পুঁটুলি খুলে একটি আম সে নদীতে ছুঁড়ে মারল। আম টুপ করে একটা শব্দ করে ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল। সে অনুভব করল, আমটি যেন তাকে নির্বোধ বলে গালি দিয়ে গেল। তার মনে হল, স্রোতোস্বতী নদী, আকাশের তারা, পেছনের পাহাড়, সবাই যেন তার নির্বুদ্ধিতা দেখে বিদ্রূপ করছে। যে দেবতা নদীর উপর দিয়ে হেঁটে কিছুক্ষণ আগে তাকে উদ্ধার করতে আসছিল, সে ফিরে গিয়ে মন্দিরে শুয়ে পড়েছে। সুখদেব নদীর কিনারায় একা একা দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল। তার কানে কমলের কণ্ঠস্বর বার বার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

"আপনি রাগ করতে পারেন, এই ভয়ে বাবা আপনাকে খাবার জন্য অনুরোধ করেননি। তিনি নিজেও কিছু খাননি। আমি তাই ভেবেই আপনার জন্য এই ফলগুলো নিয়েএসেছি।

"আপনি আমগুলো খেয়ে নিন। গাছের ফল খেতে আপনার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।"

"আপনি এত সময় উপোস করে থাকবেন, সেটা হয় না।"

সুখদেব গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। ভাবল, ''গাছের আম। অচ্ছুতেরা তো এ ফলের স্রষ্টা নয়। তাহলে ক্ষুধায় কষ্ট করা কেন?

সুখদেব একটি আমের ছাল তুলে মিষ্টরস মুখে দিল। সে আমটি খেয়ে লক্ষ্য করল, অচ্ছুৎ যুবতীর ছোঁয়া লাগা সত্বেও আমের মিষ্টতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি।। একে একে সবগুলো আম খেয়ে সে আঁটি ও ছাল হাতে তুলে নিল এবং তার খাটিয়ার কাছে রেখে দিল।

পাঁচ

উঁচু উঁচু পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য বের হয়ে এল। সুখদেব চোখ খুলতেই দেখতে পেল বুড়ো সরদার নিকটেই একটি খাটিয়ার ওপর বসে রয়েছে। কয়েকজন পাহাড়ী মানুষ নীচে ঘাসের উপর বসে সুখদেবের জেগে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে। সরদার উঠে এসে সুখদেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করার জন্য হাত বাড়াতেই সুখদেব তার হাত ধরে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে সরদারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, "আপনি আমাকে আর লজ্জা দেবেননা।"

সরদার জবাবে বলল, "আপনি আমার অতিথি। আপনার সেবা করা আমার কর্তব্য।"

"না, আমি আপনার নিকট অপরাধী। আমার অপরাধ খুবই জঘন্য। আপনি যে ধরণের ভদ্র ব্যবহার করছেন তার উপযুক্ত ব্যক্তি আমি নই।"

"ছিঃ ছিঃ অমন কথা বলবেন না। আপনি আমাদের দেবতা।"

"সেটাই আমার দুর্ভাগ্য। দেবতা না হয়ে যদি আপনার মত মানুষ হতে পারতাম, তাহলেই আমার জীবন ধন্য হতো।"

সরদার চঞ্চল হয়ে বলে উঠল, "আপনি এসব কি বলছেন?"

"আমি সত্যকথাই বলছি। আমি দেবতা নই। মহারাজার একজন সৈনিক মাত্র। আমি যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলাম, তা যদি আপনি জানতেন, তাহলে অবশ্যই আমার সঙ্গে এমন উদার ব্যবহার করতে পারতেন না। শুনুন! যদি নদীর ঢল আমাকে অসহায় অবস্থায় এখানে না পৌছাতো, তাহলে আপনারা আজ আমাদের হাতে বন্দী হতেন। আপনাদের প্রতি নিষ্ঠুরতম আচরণ করা হতো। আমি আপনাদের কুটিরগুলো জ্বালিয়ে দিতাম। আপনাদের পশু এবং চারণভূমি এতক্ষণে আমাদের দখলে এসে যেতো। বলুন, এখনও কি আমাকে আপনি দেবতা মনে করেন?"

সরদার বলল, "যদি আপনারা আমাদের ভাঙ্গা কুটির, পশু ও চারণভূমিগুলো দখল

করতে চান, তাহলে আমরা স্বেচ্ছায় এগুলো ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতে রাজী আছি। এতবড় দুনিয়া। এর মধ্যে চারণ ভূমি খুঁজে নিতে আমাদের মোটেই কষ্ট হবে না। ঘাস পাতা দিয়ে কুড়েঘর তৈরী করাও কঠিন কাজ নয়। সেজন্য যুদ্ধ বিগ্রহ ও রক্তারক্তির কি প্রয়োজন?"

সুখদেব ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে বলল, "ভগবানের দোহাই! আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। আমি এতদিন মানুষ নামেরও অযোগ্য ছিলাম। আজ আপনার কাছে আমি যে শিক্ষা পেলাম, আমার সমাজের লোকেরা আরও একশো বছরে সে শিক্ষা পাবে না। আপনি মানুষ নন্, সত্যিকার অর্থে আপনিই দেবতা। আমি আপনার দাস!" কথা কয়টি বলতে বলতে সুখদেব সরদারের সামনে নুয়ে তার পাঁ ছুঁতে চেষ্টা করা মাত্রই সরদার সুখদেবকে ধরে আলিঙ্গন করল।

উচ্চ আর নীচ—দেবত আর অচ্ছ্যুৎ—পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে অনুভব করল, তারা উভয়েই মানুষ। উচ্চ ও নীচের এ প্রভেদ, ঘৃনা ও বৈষম্য– ভগবানের সৃষ্টি নয়।

রোদ বেড়ে গেল। তারা দুজনে নিকটের একটি আম গাছের নীচে গিয়ে বসল। ঠিক সেই সময় কমল একটি মাটির পাত্র ও বাটি হাতে তাদের কাছে এসে দাঁড়াল।

সরদার জিজ্ঞেস করল, "কি নিয়ে এলে, মা, কমল?"

"দুখ নিয়ে এসেছি বাবা, অতিথির জল খাবার হয়নি।"

সরদার সুখদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "কমল রাত্রিবেলাও আপনাকে খেতে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জিদ করছিল। আপনি আমাদের অচ্ছ্যুৎ মনে করে খাবেন না ভেবে, আমি আর কিছু বলিনি। এখন আমাকে জিজ্ঞেস না করেই মেয়েটি দুধ নিয়ে এসেছে। আমাদের ঘরের দুধ পান করতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তাহলে আমি একটি গাভী এনে দেই। আপনি একটি গাছের বড় পাতায় দুধ দুইয়ে পান করে নিন।"

সুখদেব বলল, "আপনার আম খাবার পর আমার ধর্ম আর আমাকে দুধ পান করতে নিষেধ করবে না।"

সরদার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোন আম?"

সুখদেব বলল, "রাত্রিবেলা আপনি যে আম পাঠিয়েছিলেন?"

সরদারকে হতভম্ব হতে দেখে কমল বলল, "বাবা, তুমি ঘুমিয়ে পড়বার পর আমি কয়েকটি আম এনে দিয়ে গিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম, আমাদের অতিথি গাছের ফল খেতে হয়ত কোন আপত্তি করবেন না।"

সরদার সুখদেবের দিকে তাকিয়ে বলল, "মহারাজ! দুধটুকু তাহলে পান করে নিন।"

সরদারের ইঙ্গিতে কমল বাটিতে দুধ ঢেলে সুখদেবের হাতে তুলে দিল। ক্ষুধা ও পিপাসায় সুখদেব অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে নিজের ইচ্ছায় দু'বাটি দুধ পান করার পর সরদারের অনুরোধে আরও এক বাটি পান করল। আমের মত দুধও তার কাছে খুব সুস্বাদুই মনে হল। সুখদেব অনুভব করল, ছোটলোকের ছোঁয়া লেগে দুধের স্বাদ ও গন্ধের কোন পরিবর্তন হয় নি।

সুখদেবের পর সরদার নিজেও দুধ পান করল। কমল এবার পাত্রটি নিয়ে ঘরে চলে গেল।

সরদার বলল, "আমার আশংকা ছিল, আপনি আমাদের হাতের কোন কিছুই খাবেন না। তাই আগামী কাল আপনাকে নদীর ওপারে রেখে আসব বলে চিন্তা করেছিলাম। আমার তো মনে হয়, এখন আপনি আরও কয়েকটি দিন আমাদের অতিথি হিসেবে থেকে যেতে পারবেন।"

সুখদেব বিনয়ের সুরে বলল, "আপনার এ আমন্ত্রণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি আমন্ত্রণ না করলেও আমি তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার ইচ্ছা করতাম না। আমাদের সমাজে বাইরের কোন লোকের প্রবেশাধিকার নেই। কিন্তু ঐ স্বার্থপর সমাজ ত্যাগ করে কেউ যদি আপনাদের সঙ্গে থাকতে চায়, তাহলে আপনারা তো তাকে ফিরে যাবার জন্য বাধ্য করেন না?

সরদার বলল, "অবশ্যই না। আমরা তাঁকে মাথায় তুলে রাখব। তিনি এ সমাজে সকলের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমানাধিকার ভোগ করবেন।"

সুখদেব বলল, "আমার জন্য আমার নিজের সমাজের দরজা এখন বন্ধ হয়ে গেছে।"

সরদার সুখদেবকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "তাই যদি হয় তবে আমাদের এ জীর্ণ কুটিরের দরজা আপনার জন্য চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়ে রইবে।"

ছয়

কয়েকদিন সরদারের বাড়ীতে অবস্থান করার পর সুখদেব অনুভব করল, সে যেন বহুকাল থেকেই এই সমাজে বসবাস করে আসছে। এখানে কারো প্রতি কারো ঘৃণা নেই। কেউ কারো চেয়ে ছোট বা বড় নয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সুখ দুঃখের সমান অংশীদার। এই নীচ জাতের লোকেরা খুবই সরল এবং অতিথি পরায়ণ। এদের মন উদার ও দৃষ্টি স্বচ্ছ। আর্য্য সমাজ থেকে উদারতা বহুকাল আগেই বিদায় নিয়েছে। সেখানে নানা শ্রেণীর ভেদ-বিচার রয়েছে। রয়েছে ছোঁয়াছুঁয়ির সংকীর্ণতা। তারা মানুষকে মানুষ হিসাবে বুকে টেনে নিতে জানে না। ব্রাহ্মণরা ধর্মের ইজারাদার। তারা জঘণ্য পাপী হলেও অন্য জাতের নমস্য দেবতা হিসাবে পূজনীয়। নিম্নশ্রেণীর মানুষ জ্ঞানে-গরিমায় ও চরিত্রে শতগুণ উন্নত হলেও সে একজন মুর্খ ও দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণের সমমর্যাদা লাভ করতে পারে না।

সুখদেবের ইচ্ছা, সমাজে ফিরে গিয়ে সে উঁচুজাতের লোকদের নিকট উদারতার

মতবাদ প্রচার করবে। কিন্তু এ পাহাড়-জঙ্গলে সে যেন কিসের এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল। রাত্রিতে সে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ উপলব্ধি করল, কমল তার অন্তরের এক বিরাট অংশ দখল করে নিয়েছে। যে রাত্রে এ অচ্ছুৎ যুবতী তার জন্য কিছু ফল উপহার নিয়ে এসেছিল, সে রাত্রেই সুখদেব অজান্তেই তাকে নিজের অন্তরের কিছু জায়গা ছেড়ে দিয়েছে।

চিন্তা করতেই সুখদেব ভয়ে আঁৎকে উঠল। ক্ষত্রিয় বংশের রক্ত ধারার উত্তরাধিকারী হয়ে সে নিজেকে এক নীচজাতের অচ্ছুৎ যুবতীর প্রেম ভিক্ষু কল্পনা করতে গিয়ে লজ্জায় আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। সে নিজে নিজেই বলে উঠল, "না, না, এ হতে পারে না। কমল সুন্দরী, কমল সরলা, অতিথিপরায়ণ ও উদারমনা। এসবই সত্য। তবু সে নীচ বংশে জন্মেছে। সে আমার কেউ না। কেউ হতে পারে না।"

একদিন সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে সুখদেব নদীর তীরে একটি পাথরের উপর বসে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তায় নিমগ্ন হল। নদীর ওপারে মহারাজার রাজত্বে তার আর স্থান হবে না এ কথা সত্য কিন্তু যদি সে কোন দূর দেশে চলে যায়, তাহলে তো সেই সমাজে মিশে যেতে আর কোন বাধা থাকবে না। এ সমাজের সরল ও অনাড়ম্বর জীবন তার ভাল লাগছে বটে, কিন্তু তাই বলে সরদার ও তার কন্যার দয়ার পাত্র হয়ে কতদিন সে এখানে থাকবে? চিন্তিত মনে সুখদেব উঠে সরদারের বাড়ীর দিকে হাঁটতে শুরু করল!

কিছুক্ষণ আগে সূর্য অস্ত গেছে। আধো আলো আধো আঁধারে ঘাসের উপর কি যেন সে দেখতে পেল। সুখদেব এগিয়ে গেল।

কমল পথের ধারে ঘাস পরিস্কার করছে। সুখদেব তাকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি করছ, কমল?"

কমল হাসি মুখে বলল, "আপনি সেদিন যে আমগুলো খেয়েছিলেন তার আঁটিগুলো আমি এখানে পুঁতে দিয়েছিলাম। দেখুন, এ কয়দিনে তার সব কয়টিরই অংকুর বেরিয়েছে। চারাগুলির গোড়ার ঘাস সাফ করে দিচ্ছি।

সুখদেব কিছুক্ষণ আগে অন্য দেশে চলে যাবার কথা ভাবছিল। এখন কমলের কোমল সলজ্জ কণ্ঠস্বর যেন তার প্রাণে এক আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিল। জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কি কোন বিশেষ ধরণের আমের আঁটি?"

কমল মাথা নীচু করে মৃদু হেসে বলল, "না, এগুলি কোন বিশেষ আমের আঁটি নয়। তবে এ গুলো আপনার খাওয়া আম থেকে পেয়েছি।"

সুখদেব নূয়ে দেখল, অনেকগুলো আমের আঁটি থেকে সত্যি সত্যি অংকুর বের হয়েছে। বলল, "তোমার দেয়া সেই আমগুলো খুবই মিষ্টি ছিল, কমল।"

কমল তার দিকে লাজুক লাজুক চোখ তুলে তাকাল। তার গালে লজ্জার রক্ত আভা ফুটে উঠল। দৃষ্টি নামিয়ে সে বলল, "ভাল জাতের পাকা আম তো এ রকমই মিষ্টি হয়। তবে আপনি খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন বলেই বোধকরি বেশী মিষ্টি লেগেছে।"

সুখদেব বলল, "যাহোক, আমগুলো নিঃসন্দেহে খুব মিষ্টি ছিল। ঐ মিষ্টি আমের লোভে হয়ত আমাকে আরও কিছুদিন এখানে থাক্‌তে হবে।"

কমল চমকে উঠল। বলল, "তাই?"

সুখদেব বলল, "কমল! যদি বেশী দিন থাকি, তাহলে তোমরা কি বিরক্ত হয়ে পড়বে?"

কমল স্মিত মুখে বলল, অতিথির জন্য বিরক্ত হওয়া আমাদের স্বভাবেরই বাইরে। আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকুন। আপনার সেবাযত্নের কোনদিনই অভাব হবে না।

সুখদেব বিস্মিত মুখে বলল, সত্যি বলছ, কমল!

কমল বলল, "শুধু সত্যি নয়, বরং আপনি যদি ঐ কথা ভেবে চলে যেতে চান, তাহলে বাবা আপনাকে কিছুতেই যেতে দেবেন না। অবশ্য আপনি যদি উপযুক্ত আতিথ্যের অভাবে বিরক্ত হয়ে চলে যেতে চান, তাহলে আলাদা কথা। আপনার ইচ্ছায় কে বাধা দিতে পারে?"

"কমল! এ বস্তিতে এমন একজন মানুষ রয়েছে যার নিষেধ আমাকে মান্‌তে হবে।"

কমল লজ্জিত মুখে প্রশ্ন করল, "কে সে মানুষটি, জানতে পারি কি?"

"তুমি তাকে জান না?"

"না তো! যদি জানতে দেন, তাহলে তাকে গিয়ে আমি মিনতি করে বলব, সে যেন আপনাকে চলে যেতে বারণ করে।"

"কমল! তুমি জানো না। শুধু তোমার অনুরোধই আমি উপেক্ষা করে চলে যেতে পারব না। নইলে আর কেউ আমাকে বাধা দিয়ে আটকাতে পারবে না।"

কমল আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি?"

"হ্যাঁ, তুমি।"

"আপনি মহারাজার সৈনিক, উচ্চ বংশের লোক, আমার মত সাধারণ একটি বালিকার অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন?"

"করব কমল! আমি তো আমার উচ্চ বংশ এবং পদ মর্যাদা সবই ছেড়ে দিয়েছি।"

"তাহলে আমি হাজার বার বলব, আপনি থাকুন, কখনও চলে যাবেন না।"

সুখদেবের গলা কেঁপে উঠল। বলল, "তুমি যদি বল, তাহলে আমি যাব না। কখনও যাব ন। আর আমি যাবই বা কোথায়?"

ওদের কথার মঝখানে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। দুজনেই ছুটে গিয়ে একটি বড় গাছের শাখার নীচে পরস্পরের খুব নিকটে দাঁড়িয়ে নিজেদের বৃষ্টির ফোঁটা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দুজনেই নিজেকে বাঁচানোর পরিবর্তে অপরকে বাঁচানোর জন্য অস্থির হয়ে উঠল। ফলে তাদের মধ্যকার দুরত্ব দূর হয়ে গিয়ে দেহ ও মনের নৈকট্য স্থাপিত হয়ে গেল। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কারো মুখে কথাটি নেই। বৃষ্টির জোর কমে গেলে অন্ধকারে তারা হাত ধরাধরি করে ঘরের দিকে রওনা হল।

কুটিরের নিকট পৌঁছে কমল বলল, "দাঁড়ান, আমি আগে যাই। আপনি পরে আসুন।"

পরের দিন সুখদেব সরদারকে বলল, "আমাকে একটি পৃথক ঘর তৈরী করে নেয়ার অনুমতি দিন। আমার জন্য আপনাদের খুবই কষ্ট হচ্ছে।"

সরদার বলল, "আপনার মত অতিথির জন্য আমার ঘর সর্বদাই প্রশস্ত থাকবে। আমি মনে করি, বুড়ো বয়সে আমি একটি সন্তান পেয়েছি।"

সুখদেব অনুমান করল, সব কিছুই যেন কোন এক অদৃশ্য হাতের খেলা। তার নদীতে পাড়ি দেবার জন্য জ্বিদ করা, নৌকাডুবি, অচ্ছুৎদের দ্বারা উদ্ধার এবং জীবন রক্ষা, সরদার ও তার কন্যা কমলের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাদের অতিথিপরায়ণতা ইত্যাদি সবই যেন কার গোপন হাতের ইশারায় একে একে ঘটে যাচ্ছে। সুখদেব নিজেকে সেই অদৃশ্য শক্তির হাতেই ছেড়ে দিল।

রাত্রিকালে সাধারণত সুখদেবের খাটিয়া ঘরের বাইরে পেতে দেওয়া হয়। অবশ্য বৃষ্টিবাদল হলে তাকে ঘরেই এক কামরায় শুতে হয়। সেখানে চিতা বাঘ ও ভাল্লুকের চামড়া দিয়ে তার বিছানা পাতা হয়। দেয়ালে তার তরবারীখানিও লটকানো হয়। তরবারীখানি সে ফেলেই দিয়েছিল। কিন্তু কমল সেটি তুলে নিয়ে এসে ঐখানে ঝুলিয়ে রাখে।

সাত

ভাদ্র মাসের পর থেকেই আবহাওয়ায় শীতের প্রভাব লক্ষ্য করা গেল। এখন সবাই বাইরে শোয়া বন্ধ করে দিয়ে ঘরে শোয়া শুরু করেছে। সরদার রাত্রির খাবার পর সুখদেব ও কমলকে নিজের কামরায় ডেকে নিয়ে নানা বিষয়ে গল্প গুজব করে। অনেক রাত্রিতে সুখদেব নিজের বিছানায় এপাশ ওপাশ করে অপর দিকের কামরায় নিদ্রিতা কমলকে কল্পনার চোখে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সুখদেব নিকটের একটি জলাভূমির চারদিকে হেঁটে বেড়ায়। তারপর ঝিলে নেমে স্নান সেরে সেখান থেকে বড় বড় পদ্মফুল তুলে নিয়ে ঘরে ফেরে।

একদিন সুখদেব নিজের কামরায় বসে সদ্য তুলে আনা একটি পদ্মফুল নিজের গালে লাগিয়ে সুখানুভব করছে, ঠিক এমনি সময়ে কমল দুধের বাটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুক্‌ল। কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে সুখদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "নিন, এই দুধটুকু খেয়ে নিন।"

সুখদেব থতমত খেয়ে কমলের দিকে ফিরে তাকাল। হাত থেকে তার ফুলটি নীচে পড়ে গেল। কমল দুধের বাটিটি সুখদেবের হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ফুল খুব পছন্দ করেন, তাই না?

সুখদেব হাসিমুখে বলল, "পছন্দ তো করি। কিন্তু কেন করি তা কি জান?"

কমল হাসি মুখে বলল, ''না তো!"

"পছন্দ করি এজন্য যে, এই ফুলটির নাম কমল।"

কমল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। তার চেহারায় এমন এক অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে উঠল যা সুখদেব আগে আর কখনও দেখেনি।

সুখদেব বলল, "কমল! তুমি এই পদ্ম ফুলের চেয়েও অনেক বেশী সুন্দর।"

কমল নিজের ঠোঁটের উপর তর্জ্জনী রেখে সুখদেবকে চুপ করতে ঈশারা করল এবং চোখের ইঙ্গিতে শাসনের ভঙ্গীতে পাশের কামরাটি দেখিয়ে দিল। সুখদেব হত চকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "সরদারজী এখনও কামরায় আছেন নাকি?"

কমল ফিস ফিস করে বলল, "হ্যাঁ, বাবা বাইরে যান নি।"

সুখদেব গলার স্বর আরও খাটো করে বলল, "আমি তো সত্যি কথাটিই বলেছি, কমল! কোন অন্যায় তো করি নি।"

কমল বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা ঢের হয়েছে। এবার দুধটুকু খেয়ে নিন তো।"

সুখদেব দুধের বাটি মুখে লাগাতেই হঠাৎ বাড়ীর বাইর থেকে চীৎকার শোনা গেল।

কমল ভয় পেয়ে বলল, "বাইরে বোধহয় কোন গোলমাল হচ্ছে।"

সুখদেব দুধটুকু এক চুমুকে শেষ করে বলল, "আমি তো চারদিক থেকেই চীৎকার শুন্‌ছি। মনে হচ্ছে ওরা এসে গেছে।

কমল শুকনো মুখে প্রশ্ন করল, "কারা?"

"বাহাদুর দেব-সেনাগণ।" বলে সুখদেব তরবারী হাতে নিয়ে বলল, "দাঁড়াও, আমি দেখছি।"

সুখদেব কামরা থেকে বের হতে না হতেই কয়েক জন লোক দৌড়ে এসে বাড়ীতে ঢুকল। তারা উঠানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল, "সরদারজী কোথায়? ওরা এসে গেছে। আমাদের লোকজনকে ওরা হত্যা করতে শুরু করেছে।"

সুখদেব জিজ্ঞেস করল, "কারা এসেছে?"

সুখদেবের কথায় কর্ণপাত না করে লোকগুলো চীৎকার করতে লাগল, "সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের সবাইকে ওরা মেরে ফেলবে।"

সুখদেব বের হতে যাচ্ছিল, একজন যুবক তার হাত ধরে বলল, "কোথায় যাচ্ছেন? খবরদার বাইরে যাবেন না। ওরা সংখ্যায় অনেক। মরণের মুখে এই ভাবে যাওয়া ঠিক নয়।"

সরদার চোখ কচলাতে কচলাতে নিজের কামরা থেকে বের হয়ে কী হয়েছে জানতে চাইল। একজন বলল, "রাত্রিবেলা ওরা নদী পার হয়ে চলে এসেছে এবং হঠাৎ

আক্রমণ করে আশেপাশের বস্তিগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমাদের বস্তিতেও সৈনিকরা প্রবেশ করেছে। যাকে সামনে পাচ্ছে, মেরে ফেলছে। বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এখন আর দাঁড়াবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি পালানো দরকার।"

সরদার সুখদেবের মুখের দিকে তাকাল। সুখদেব বলল, "আপনারা এখানে থাকুন। আমিদেখছি।"

ততক্ষণে কিছুলোক দৌড়ে এসে বলল, "সৈনিকেরা এদিকেই আসছে।" সুখদেব ছুটে বের হয়ে গেল।

আট

সুখদেব সরদারের বাড়ী থেকে বের হয়ে দেখতে পেল দূরে আগুন জ্বলছে আর ভীত-সন্ত্রস্ত লোকজন এদিক সেদিক ছুটাছুটি করছে। বেশীর ভাগ লোকই পালাচ্ছে পাহাড়ের দিকে। অল্প কয়েকজন লোক সরদারের নিকট পরামর্শ চাইতে এসেছে। ওদিকে একজন ঘোড় সওয়ার অফিসারের নেতৃত্বে একদল পদাতিক সৈন্য নিরীহ লোকদের বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সুখদেব সেদিকে ছুটে গেল। হঠাৎ সৈনিকেরা তাদের এই পুরাতন সেনাপতিকে দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। তাদের যুবক দলপতি "সেনাপতিজী," "সেনাপতিজী" বলে চীৎকার দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে সুখদেবের পা ছুঁয়ে প্রনাম করল। এ যুবক রামদাস। সে বলল, "ভগবানকে ধন্যবাদ। আপনি তাহলে বেঁচে রয়েছেন? আপনি এতদিন কোথায় কি ভাবে রইলেন?"

সুখদেব বলল, "এখন আলাপ করার সময় নেই। সৈনিকদের হত্যা ও লুটতরাজ করতে নিষেধ কর।"

"কিন্তু--"

"কোন কিন্তু নেই। আমি তোমাকে হুকুম দিচ্ছি।"

"আপনার আদেশ শিরোধার্য, তবে এখন গঙ্গারাম আমাদের সেনাপতি। তিনি হুকুম দিয়েছেন, একজনকেও জীবিত পালিয়ে যেতে দেয়া চলবে না।"

সুখদেব উচ্চঃস্বরে বলল, "আমি তোমাকে আদেশ করছি, রামদাস। এই কাজ বন্ধ কর।"

সাবেক সেনাপতির রাগান্বিত চোখমুখ দেখে রামদাসের মনে পুরাতন আনুগত্যের মনোভাব ফিরে এলো। সে চোখের নিমিষে ঘোড়া ছুটিয়ে বস্তির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুখদেব সৈনিকদেরও আদেশ করল, তারা যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে হত্যা ও লুটতরাজ বন্ধ করার নির্দেশ পৌঁছে দেয়। সৈনিকগণ পুরাতন সেনাপতির আদেশ সকলের নিকট পৌঁছে দিতে শুরু করল।

একটি টিলার উপর থেকে নিজের সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে গঙ্গারাম তার জীবনের পবিত্রতম দায়িত্ব পালনের দৃশ্য দেখছিল। আট দশজন সশস্ত্র প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বীর সেনাপতি নিরস্ত্র ও অসহায় বস্তিবাসীদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে দেবতাদের আশীর্বাদ লাভ করছিল। রামদাসকে ঘোড়া চড়ে ফিরে আসতে দেখে সেনাপতি আশ্চর্য হল। রামদাস নিকটে এসে বলল, "মহারাজ সেনাপতিজীকে পাওয়া গেছে। তিনি বস্তিবাসীদের হত্যা করতে এবং তাদের বাড়ীঘরে আগুন জ্বালাতে নিষেধ করেদিয়েছেন।"

গঙ্গারাম ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "কোন সেনাপতি? সেনাপতি তো আমিই! কি ব্যাপার, রামদাস? তোমার কি মতিভ্রম ঘটেছে?"

"আমার মতিভ্রম ঘটেনি মহারাজ! এক্ষুণি আমি সেনাপতি সুখদেবকে দেখে এসেছি। তিনি আমাকে নরহত্যা এবং অগ্নি সংযোগ বন্ধ করার জন্য আদেশ করেছেন।"

"তুমি বলছ যে, সুখদেব এখানে আছে এবং তোমাদের তার হুকুম মেনে কাজ করতে বলছে। অর্থাৎ আমার এবং মহারাজার আদেশ অমান্য করতে সে নির্দেশ দিচ্ছে! তাই নয় কি?"

"মহারাজ! তিনি একথা বলেননি। তিনি বলেছেন, এসব লোক নিরপরাধ। এদের হত্যা করা অন্যায়।"

"আচ্ছা, শত শত বছর ধরে এ বন্য পশুগুলো আমাদের মহারাজার অবাধ্য হয়ে এখানে স্বাধীন জীবন যাপন করছে। আর সুখদেব কিনা বলে ওরা নিরপরাধ! কোথায় সেসুখদেব?"

রামদাস বস্তির অপর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "ঐখানে মহারাজ!"

গঙ্গারাম ও তার সঙ্গীগণ রামদাসের সঙ্গে দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সুখদেবের সন্ধানে এগিয়ে চলল।

এখানে সুখদেব রয়েছে শুনে অনেক সৈনিক ছুটে এসে তার নিকটে জড়ো হয়েছিল। পাহাড়ী সরদার সাধন এবং তার লোকেরা মনে করল, হয়ত এ যাত্রা তারা রক্ষা পেয়ে গেল। তাই তারাও ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে একটু দূরে দাঁড়াল। সুখদেব সাধনের বিমর্ষ চেহারা এবং কমলের অশ্রু-সজল চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা অবনত করল।

একজন যুবক একটি আহত শিশুকে কোলে নিয়ে সুখদেবের কাছে হাজির হল। তারপর শিশুটিকে তার পায়ের কাছে রেখে দিল। নিষ্পাপ ফুলের মত শিশুটির বুক থেকে তখন রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। শিশুটির দু'চোখে অসহায় কাতর দৃষ্টি। তার সারা দেহে তখন মৃত্যুর চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

সুখদেবের অন্তর বেদনায় হাহাকার করে উঠল। সে শিশুটিকে পরম স্নেহে কোলে

উঠিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে শিশুটির মুখ থেকে এক ঝলক রক্ত বের হয়ে এলো এবং নিষ্পাপ শিশুটি চিরদিনের মত চোখ বন্ধ করল। শোকে অভিভূত সুখদেব শিশুটিকে মাটিতে শুইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি রমনী চীৎকার করে মৃত দেহটি বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর কাটা কবুতরের মত তড়পাতে লাগল।

দেবতার সৈনিকেরা অবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। তাদের প্রাক্তন সেনাপতি সুখদেব একটি অচ্ছূৎ শিশুর মৃত্যুতে কেন এত শোকার্ত হয়ে পড়ল, তারা তার কারণ খুঁজে পেল না। সৈনিকেরা মনে করল, সুখদেব আসলে পাগল হয়ে গেছে।

ততক্ষণে রামদাসের সঙ্গে নতুন সেনাপতি গঙ্গারাম ও তার সঙ্গীগণ সেখানে পৌঁছে গেল। গঙ্গারাম চেঁচিয়ে বলতে শুরু করল, "সুখদেব! তুমি এখানে আর আমার নিকটে এতগুলো অচ্ছূৎ নরনারী কোন সাহসে দাঁড়িয়ে রয়েছে? তোমার কি হয়েছে? মোটেই লড়ছ না কেন?"

একথাগুলো শুনেই সাধন সরদার, কমল ও তাদের মুষ্টিমেয় সাথী ছাড়া বাকী সবাই এদিক-সেদিক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

গঙ্গারাম রাগে কাঁপতে লাগল। সে সুখদেবের সামনে এসে বলল, "তুমি জীবিত রয়েছ দেখে আমি খুবই খুশী হয়েছি। একজন সৈনিক হিসাবে প্রাক্তন সেনাপতিকে সম্মান করাও আমার কর্তব্য। কিন্তু আমি সেনাপতি। তুমি আমার সৈন্যদের রাজা ও সমাজের বিরুদ্ধাচরণে উস্কানী দিচ্ছ। তুমি নিজে তো কর্তব্য পালন করতেই পারনি। এখন ব্যক্তিগত দুশমনীর কারণে আমাকেও সফলতা অর্জন করতে না দেয়ার উদ্দেশ্যে এ অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছ।"

সুখদেব নীরবে হতভাগিনী মায়ের কোল থেকে মৃত শিশুর লাশটি তুলে নিয়ে গঙ্গারামের সম্মনে রেখে বলল, "এই তো তোমার সফলতার সব চাইতে বড় প্রমাণ। এ নিষ্পাপ শিশুর রক্ত দিয়ে তোমার সমাজ ও রাজার বীরত্বের ইতিহাস লিখে রাখো, গঙ্গারাম! তোমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এ কৃতিত্বের ইতিহাস পড়ে বুক ফুলিয়ে গর্ব করতেপারবে।"

গঙ্গারাম চেঁচিয়ে বলল, "আমার সমাজ! আমার রাজা! তোমার কিছু নয়? এ অপবিত্র মাংসপিন্ডটি তুমি হাতে ধরে নিজের ধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেলে না?"

"এ নিষ্পাপ শিশুর দেহ তোমার দেহের চাইতেও অনেক বেশী পবিত্র, গঙ্গারাম।"

গঙ্গারাম রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "সুখদেব! তুমি চন্ডাল হয়ে গেছ। একটি কুকুরীর বাচ্চাকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে বলছ কিনা ওটা আমার দেহের চেয়েও বেশী পবিত্র। ছিঃ ছিঃ, তোমার এতই অধঃপতন হয়েছে সুখদেব? ওরা তোমায় যাদু করেছে নাকি?"

সুখদেব তাড়াতাড়ি শিশুর লাশটি মায়ের কোলে তুলে দিয়ে তরবারী হাতে গঙ্গারামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালা।

গঙ্গারাম ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নীচে নামল। তারপর তরবারী খাপ মুক্ত করে সেও

দাঁড়িয়ে গেল। সিপাইদের মধ্যেও প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দিল। তা দেখে গঙ্গারাম বলল, "সাবধান! আমার প্রতি সুখদেবের ব্যক্তিগত শত্রুতা রয়েছে। তোমরা কেউ এর ভিতর নাক গলাবে না।"

দুই সেনাপতি তরবারীর ঘায়ে পরস্পরকে ঘায়েল করার চেষ্টায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। সুখদেবের প্রচন্ড আক্রমণে গঙ্গারাম পেছনের দিকে হটতে বাধ্য হল। হঠাৎ পা ফস্‌কে মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। পড়েই আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু সুখদেবের তরবারীর অগ্রভাগটি তার বুক ছুঁয়ে নিশ্চল হয়ে রইল। দুমুহূর্ত পর সুখদেব তরবারী উঠিয়ে নিয়ে বলল, "ওঠো সেনাপতিজী! তোমার বেকায়দা অবস্থায় আমি তোমাকে হত্যা করব না।"

গঙ্গারাম উঠে দাঁড়াবার পর সুখদেব বলল, "এবার সামলে নিয়েছ তো। তাহলে এগিয়েএসো।"

পুনরায় দুজনের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এক উত্তেজনাকর মুহূর্তে যখন গঙ্গারাম সুখদেবকে আঘাত করতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় পাহাড়ী সরদার সাধন চেঁচিয়ে বলল, "থামুন! আপনারা আমাদের মত নগণ্য মানুষের জন্য পরস্পরকে হত্যা করবেন না। আমরা—" তার মুখের কথা শেষ হ'বার আগেই সাধন এসে যুদ্ধরত উভয় সেনাপতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল এবং ঠিক ঐ সময়েই সুখদেবের উদ্দেশ্যে গঙ্গারাম তরবারীর যে প্রচন্ড আঘাতটি করেছিল, তা সরদারের মাথাটিকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলল। কমল "বাবা" বলে চীৎকার করে লুটিয়ে পড়ল। সুখদেবও তরবারী ছেড়ে দিয়ে মরণোন্মুখ বৃদ্ধের হাত খানি ধরে চুমো খেতে খেতে বলল, "আমার জীবন রক্ষাকারী বাবাজী! তুমি কেন আমাদের মাঝখানে এসে এভাবে নিজের জীবন বিসর্জন দিলে?"

একটি শূদ্র শিশুর হত্যাকান্ডকে উপলক্ষ্য করে সুখদেবের ব্যবহার সৈনিকদের নিকট খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হল। তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। এবার নীচ জাতের এ সরদারকে "বাবা" সম্বোধন করায় তারা মনে করল সুখদেবের সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

গঙ্গারাম বলল, "তোমার প্রতি দেবতাদের অভিশম্পাত বর্ষিত হোক। তুমি এক শূদ্রকে "বাবাজী" সম্বোধন করে হিন্দু জাতির চরম অবমাননা করছ।" সে সিপাইদের হুকুম করল। সুখদেবকে গ্রেফতার কর। কমল এ সময় হঠাৎ পিতার লাশ ছেড়ে দিয়ে সুখদেবের ছুঁড়ে দেয়া তরবারীখানা উঠিয়ে নিল এবং বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গিয়ে গঙ্গারামকে আঘাত করল। একজন সৈনিক তার হাত ধরে ফেলেছিল। তবু ঐ আঘাতে গঙ্গারামের পা আহত হল। সৈনিকগণ সুখদেব ও কমলকে ভালভাবে মজবুত রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল। আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রেফতারীর সময় সুখদেব একটুও নড়াচড়া করল না। তার মুখ থেকে কোন প্রতিবাদও বের হয়ে এলো না।

নয়

তিনখানি নৌকা সুরমা নদীর ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। একটি নৌকায় গঙ্গারাম, রামদাস এবং কতিপয় সৈনিক। দ্বিতীয় নৌকায় সুখদেব, কমল ও কয়েকজন প্রহরী এবং তৃতীয় নৌকায় কয়েকটি ঘোড়া বাঁধা রয়েছে।

দেব-দ্রোহীদের সরদারকে হত্যা করার পর গঙ্গারাম বুঝতে পেরেছে যে, শূদ্রেরা আর আক্রমণ করতে সাহসী হবে না। তবু সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে সে তার ভাই জয়রামের অধীনে সৈন্যদলকে সেখানে রেখে নিজে কতিপয় সৈন্যসহ সুখদেবকে নিয়ে মহারাজার দরবারের রওনা হল। লুটতরাজের এ সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিয়ে যে সব সৈনিক গঙ্গারামের সঙ্গে ফিরে যাচ্ছে তারা মোটেই খুশী নয়। গঙ্গারাম তার এ বিজয়ের খবর নিজের মুখেই মহারাজার নিকট পৌছ বার জন্য ভীষণ ব্যগ্র। তাছাড়া, সুখদেবের লাঞ্ছনা দেখার আগ্রহও তার কম নয়। কারণ সুখদেব এক সময় রাজ দরবারে বিশেষ সম্মান লাভ করতো। তার উপস্থিতিতে গঙ্গারাম একজন সাধারণ সামরিক অফিসার ছিল মাত্র।

সুখদেব কমলকে বলল, "আমার জন্যেই তোমাদের এ দুর্দ্দশা হল, কমল!"

কমল বলল, "আমাকে গ্রেফতার করার সময় আপনি আমাকে ছেড়ে দিতে বলেছিলেন। আপনি কি মনে করেন, এই অচ্ছুৎ বালিকাটি বিপদের সময় আপনাকে ছেড়ে চলে যাওয়া নিজের জন্য নিরাপদ মনে করে?"

সুখদেব ম্লান হেসে বলল, "না, কমল! তুমি তো আমার নিকট অচ্ছুৎ নও। কিন্তু তোমাকে আমার সঙ্গে বিপদের মধ্যে টেনে আনা আমার জন্যে বাস্তবিকই বেদনাদায়ক।"

কমল কান্না ভেজা কণ্ঠে বলল, আপনি তো স্বচক্ষেই দেখেছেন, বাবার আমি কেমন আদরের কন্যা। বাবাকে এরা আমার চোখের ওপর নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। পৃথিবীতে এখন আমার কে আছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে? এখন যদি আপনার পদতলে আমি আশ্রয় পাই, তবে আপনার সাথে মরণ হলেও আমার কোন দুঃখ থাকবে না।

নৌকা তীরে ভিড়ল। গঙ্গারাম বলল, "সুখদেব! আমি তোমাকে সাধারণ কয়েদীর মত দরবারে নিয়ে যেতে চাই না। যদি তুমি পালাবে না বলে অঙ্গীকার কর, তাহলে আমি তোমার হাতের বাঁধন খুলে দেব এবং তোমাকে ঘোড়ায় সওয়ার করিয়ে নিয়ে যাব।"

সুখদেব বলল, "আমি কথা দিতে পারি, তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, এই মেয়েটিরও হাতের বাঁধন তোমাকে খুলে দিতে হবে এবং তার জন্যও ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে

হবে।"

গঙ্গারাম প্রথম শর্ত মঞ্জুর করে নিয়ে উভয়ের হাতের বাঁধন খুলে দিল। কিন্তু এ "নীচ" জাতের বালিকার জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করায় সুখদেবও কমলের সঙ্গে হেঁটেই চলল।

ঠিক একদিন পর সুখদেবকে সশস্ত্র প্রহরাধীন মহারাজার দরবারে বিচারের জন্য হাজির করা হল। সে অত্যন্ত ধীর ও সুমিষ্ট ভাষায় নিজের সাফাই পেশ করতে গিয়ে বলল, "মানুষের রচিত শ্রেণী-বিদ্বেষ, জাতিভেদ প্রথা নেহায়েতই অযৌক্তিক। তথাকথিত অচ্ছূৎগণ কোন অপরাধ করেনি। তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের এলাকায় শুধুমাত্র বসবাস করেছে। কারো কোন অনিষ্ট চিন্তাই তারা করে না। তাদের বাড়ীঘর জ্বালানো এবং পাইকারী হারে বিনা-অপরাধে হত্যা করার নাম ধর্ম হ'তে পারে না।" সুখদেব গঙ্গারামের অভিযোগগুলোর কোনই জবাব দেয়ার দরকার মনে করল না।

সুখদেবের যুক্তিপূর্ণ কথায় মহারাজার মন সায় দিলেও পুরোহিতের ভয়ে তিনি তার স্বপক্ষে কোন কথাই বলতে পারলেন না।

পুরোহিত রাজার চেহারা দেখে বুঝতে পারল যে, তিনি সুখদেবের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাই সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "মহারাজ! সুখদেব জঘন্য অপরাধে অপরাধী। তাকে দেব-দ্রোহী অচ্ছূৎ সমাজকে দমন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সে তাদের দমন করার পরিবর্তে ঐ সমাজেরই এক ঘৃণ্য বালিকার সঙ্গে প্রেম করে ধর্মের অশেষ ক্ষতি করেছে। তাকে লঘু শাস্তি দিলে সমাজের নিয়ম-শৃংখলা ভেঙ্গে যাবে। হাজার হাজার যুবক উচ্ছৃংখল হয়ে যাবে। তাই প্রার্থনা, তাকে বিনা দ্বিধায় মৃত্যুদন্ড দেয়া হোক।"

মহারাজা পুরোহিতের চোখমুখ দেখে বুঝতে পারলেন, সুখদেবের প্রতি সামান্য মাত্র দয়ার মনোভাব দেখালেই পুরাহিত ঠাকুর নারাজ হয়ে পড়বে। তিনি বললেন, এ বিষয়ে পুরোহিত ঠাকুরই চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন।

পুরোহিত ঠাকুরের ঠোঁটে বিজয়ের হাসি ফুটে উঠল। সে দাঁড়িয়ে বলল, "মহারাজ! ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট করা মহাপাপ। সুখদেব মহাপাপী। তাকে কালীমন্দিরে বলিদান করা হোক। আর এ অচ্ছূৎ বালিকাকে হাত পা বেঁধে সুখদেবের জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করা হোক।"

পুরোহিতের রায় শুনে সুখদেব নিজের জন্য কোন চিন্তা করল না। কিন্তু কমলের জন্য পুরোহিতের নিষ্ঠুর দন্ডাদেশ শুনে তার সারা গা শিউরে উঠল। সে এগিয়ে গিয়ে সিংহাসনের সামনে মাথা নুইয়ে আবেদন করল, "মহারাজ! আমাকে যদি আপনি কালীমন্দিরে বলিদান করতে চান, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এই সরলা বালিকাটি সম্পূর্ণ নির্দোষ। যদি আমার পূর্বপুরুষেরা আপনার বংশের নিঃস্বার্থ সেবা করে থাকে, তাহলে আমি আপনার নিকট এটুকু দয়া ভিক্ষা চাই। এই বালিকাকে তার নিজের লোকদের কাছে ফিরে যেতে দিন।

সুখদেবের কাতর আবেদনে মহারাজের হৃদয় দয়ার্দ্র হয়ে উঠল। কিন্তু পুরোহিতের হিংস্র চোখের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তিনি সাহস হারিয়ে ফেললেন। দু মূহূর্ত পর নিজের আসন থেকে উঠে তিনি পাশের একটি কামরায় প্রবেশ করলেন।

পুরোহিত ঠাকুর সুখদেবকে লক্ষ্য করে বলল, "এই অচ্ছুৎ বালিকাকে তুমি যত পবিত্রই মনে কর না কেন, সমাজের আইনে সে নীচ। উঁচু বংশের দেব-সেনাপতিকে প্রেমের জালে বন্দী করে ভ্রষ্ট করার অপরাধে সে অপরাধিনী। মায়াজাল বিস্তারকারিনী এই ভ্রষ্টা নারীকে অবশ্যই তোমার চিতাতেই জ্বলতে হবে।

দশ

অন্ধকার কারাগারের একটি কোঠায় সুখদেব ও অপর কোঠায় কমলকে বন্দী করে রাখা হল। রাত্রিশেষে তাদের বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবে দেব-সৈনিকেরা। বাইরে সশস্ত্র প্রহরীর জুতার খট্ খট্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। মনে মনে স্রষ্টাকে স্মরণ করে তাঁরই সমীপে সুখদেব সাহায্যের আবেদন পেশ করছিল। হঠাৎ বাইরে কিসের একটা গোলমাল শোনা গেল। চীৎকার এবং হৈচৈ থেকে বুঝা যায় যে, দু'দল সৈন্যের মধ্যে লড়াই হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ কারাগারের দরজা খুলে গেল এবং একদল মুখোশধারী সৈনিক হুড়মুড় করে কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের দলপতি এগিয়ে এসে বলল, "সেনাপতিজী! তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসুন। আমরা প্রহরীদের হত্যা করেছি। একজন মাত্র পালিয়ে গেছে। হয়ত সে আরও সৈন্য সঙ্গে করে নিয়ে ফিরে আসতে পারে। আপনার ঘোড়া তৈরী। কালক্ষেপ না করে আপনি এক্ষুনি পালিয়ে যান!"

সুখদেব গলার স্বর শুনে আগন্তুককে চিন্‌তে পেরে বলল, "রামদাস! প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাব আমি?"

রামদাস বলল, "কেন যাবেন না? এখানে এ অত্যাচারী রাক্ষসদের হাতে প্রাণ দেয়ার কি কোন অর্থ হয়? যা বলছি করুন। মোটেই দেরী করবেন না। শীগগীর বের হয়েআসুন।"

সুখদেব বলল, "রামদাস! সরলপ্রাণা গ্রাম্য বালিকা কমলকে এদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি কি করে পালিয়ে যেতে পারি?"

রামদাস নিরুত্তর হয়ে গেল। এক মুহূর্ত কী চিন্তা করে সে এক দৌড়ে উধাও হয়ে গেল। তারপর পাশের কামরার তালা খুলে কমলকেও মুক্ত করে দিয়ে দুজনকেই হাত ধরে টেনে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো। সামনে একটি আম গাছের নীচে একজন সিপাই

ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সুখদেব ও কমলকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়ে রামদাস বলল, "সূর্য উদয় হ'বার আগেই আপনারা রাজ্যের সীমানা ছেড়ে চলে যাবেন। এক্ষুণি রওনা হয়ে যান। আর আমার এ তরবারী খানা সঙ্গে রাখুন। পথে বিপদ আপদে এটি কাজে আসবে। বোন কমলকে তীরধনুক দিয়ে দিলাম। আচ্ছা আসুন। নমস্কার।

যুবক রামদাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কোন ভাষা খুঁজে পেল না। সুখদেব শুধু বলল, "বিদায়, রামদাস। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে।"

রাতভর ঘোড়া ছুটে চলল উর্ধশ্বাসে। সূর্যোদয়ের আগে তারা রাজ্যের শেষ প্রান্তে একটি ঘন জংগলে পৌছে গেল। সুখদেব বিশ্রাম করার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিয়ে জংগলের ভিতর একটি নিরাপদ জায়গায় অবতরণ করে ঘোড়াটিকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল।

দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময় জংগলের মধ্যস্থিত সড়কে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেয়ে সুখদেব বুঝতে পারল, দেব– সৈনিকেরা তাদের খুঁজতে বের হয়েছে। কমল ভীত হয়ে পড়ল। সুখদেব আশ্বাস দিয়ে বলল, "ভয় করোনা কমল। এরা আমাদের খুঁজে বের করতে পারবে না।"

সেনাপতি গঙ্গারাম তার সঙ্গীদের জোরে জোরে বলতে লাগল, এ জংগলের মধ্যে তন্ন তন্ন করে ওদের খুঁজতে হবে। কিছুতেই এ ধর্মদ্রোহীদের পালাতে দেয়া যাবে না।"

একজন সৈনিক বলল, "মহারাজ! আমরা মাত্র কুড়িজন লোক। সুখদেবের সঙ্গে কত লোক রয়েছে তা আমাদের জানা নেই। প্রহরীদের হত্যা করে তাকে কারাগার থেকে যারা উদ্ধার করে নিয়ে গেছে, তাদের সংখ্যা নেহায়েৎ কম হতে পারে না। তাই আমাদের সাবধান থাকা দরকার।"

গঙ্গারাম ধমক দিয়ে বলল, "কাপুরুষের মত কথা বলো না। পলায়নকারী কখনও লড়াই করার ক্ষমতা রাখে না।"

সুখদেব গঙ্গারামের স্বর লক্ষ্য করে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে তার কাছে পৌছে গেল এবং গঙ্গারামের কথা শেষ হতে না হতেই একটি তীর ছুঁড়ে দিল। গঙ্গারাম বিকট চীৎকার করে মাটিতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সুখদেবের ধনুক থেকে শন্ শন্ করে আরও কয়েকটি তীর আশে পাশে এসে পড়তে লাগল। ভীত সন্ত্রস্ত সৈনিকেরা আহত গঙ্গারামকে ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

সুখদেব কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর যখন বুঝতে পারল যে, দুশমনরা পালিয়েছে, তখন কমলের নিকট ফিরে গিয়ে বলল, " কমল ওঠো, চল, আমরা আবার যাত্রা শুরু করি।"

এগার

দুদিন যাবৎ বন-জংগল আর পাহাড়ী পথে চলার পর সুখদেব ও কমল খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঘোড়াটিও আর চলতে পারছে না। তাদের কিছু খাবার এবং কিছুক্ষণের জন্য নিরাপদ বিশ্রামের জায়গা প্রয়োজন। কিন্তু এ জনমানবহীন জংগলে তো লোকালয়ের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। এক সময় কমল উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

বলল, ''কোথায় যেন বাঁশীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না?''

সুখদেবও কান খাড়া করে শুন্‌ল এবং বলল, "হ্যাঁ বাঁশীই তো মনে হয়। চল, খোঁজ নিয়েদেখি।"

কিছুদূর অগ্রসর হবার পর দেখা গেল একজন মেষের রাখাল গাছের ডালে বসে আপন মনে বাঁশী বাজিয়ে যাচ্ছে। আগন্তুকদের দেখে বংশীবাদক অবাক হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলো। সুখদেব বলল, "ভাই! তুমি আমাদের কিছু খাবার দিতে পারো? দুদিন থেকে আমরা কিছুই খেতে পাইনি।"

রাখাল বালকটি ছুটে গিয়ে কয়েকটি মেষ ধরে নিয়ে এলো। তারপর তাদেরকে দাঁড় করিয়ে এক এক করে দুধ দুইতে শুরু করল। বাটি পূর্ণ হলে সে সুখদেবের দিকে দুধের বাটিটি এগিয়ে দিল। সুখদেব কমলের দিকে বাটিটি এগিয়ে দিল।

কমল বলল, ''না, আপনি আগে পান করুন।''

সুখদেব পান করার পর রাখাল একবাটি দুধ দুইয়ে কমলের সামনে রাখল। পালাক্রমে কয়েক বাটি দুধ পান করার পর তারা পরিতৃপ্ত হয়ে একটি গাছের নীচে ঘাস পাতার নরম আস্তরনের উপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই ঘোড়াটির দিকে সুখদেব জোরে একটি পাথর ছুড়ে দিল। ঘোড়াটি ছুটে অন্য দিকে চলে গেল।

রাখাল বলল, "একি করলেন ? ঘোড়াটি তো চলে যাবে।''

সুখদেব বলল, ওটাকে তো মুক্ত করেই দিলাম। ঘোড়তে আর আমার প্রয়োজন নেই।

রাখাল বলল, "মহারাজ ! আমার নাম পাঁচু। মেষ চরানো আর চাষাবাদ করাই আমার পেশা। আপনাদের পরিচয় জানতে পারলে খুশী হতাম।

সুখদেব সংক্ষেপে পাঁচুর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলল। সকল কথা শুনে পাঁচু বলল, 'আপনারা এখন অনেক দুরে চলে এসেছেন। আর ভয়ের কোন কারণ নেই। আমাদের সরদার খুবই ভালো লোক। তাঁর নিকটে গেলে তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের আশ্রয় দেবেন।

বিকালে পাঁচুর সঙ্গে সুখদেব আর কমলকে পাহাড়ের উপত্যকায় একটি ছোট্র বস্তিতে প্রবেশ করতে দেখে মহল্লার লোকজন সব ছুটাছুটি করে তাদের দেখতে এলো। পাঁচু তার কুটিরের সামনে গিয়ে দু'টি দড়ির খাটিয়া বের করে অতিথিদের বসতে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রটে গেল যে, এক বড় সরদারের কন্যা এবং তার ক্ষত্রিয় স্বামী

দেশ ত্যাগ করে চলে এসেছে। স্বামীটি ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং এক সময় এক রাজার সেনাপতি ছিলেন। ছোট জাতের সরদার কন্যাকে বিয়ে করার অপরাধেই তার এ বিপত্তি ঘটেছে।

গ্রামের বৃদ্ধ মতি সরদারও তাদের দেখতে এলো। বৃদ্ধ লোকটা সুখদেবের পায়ের ধূলা নিতে চাইলে সুখদেব তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "না, না, ঐ কাজটি করবেন না সরদারজী! আপনি বয়সে বড়। আমার গুরুজন ব্যক্তি। আমাকে অপরাধী করবেন না।"

কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সরদার বলল, "গরীবদের ঘর-দরজা সবই আপনাদের। যতদিন ইচ্ছা, আপনারা এখানে থাকুন। আপনাদের সেবা করতে পারাই আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়।"

পাঁচুকে ডেকে সরদার বলল, "পাঁচু! তাঁদের নিয়ে আমার বাড়ী চল। সেখানেই তারা খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করবেন।"

পাঁচু বলল, "খাবার তো তৈরী হয়ে গেছে, সরদার?"

"এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে খাবার তৈরী করলে?"

"সরদার! আপনার ঘরে থেকেই ভাত আর মাংস এসেছে। ললিত দুধ দিয়ে গেল। কাঞ্চন দিয়ে গেল মর্তমান কলা। আরও অনেকের ঘর থেকে নানা রকমের তরকারী এসেছে। আমি তো অনেকের খাবার ফিরিয়েও দিয়েছি।"

"আচ্ছা, তাহলে খাবার শেষ হলে অতিথিদের আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিও।"

পাঁচু বলল, "না সরদার! আজ তাঁরা আমার এখানেই থাকবেন। কাল তাঁদের আমি আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দেব।"

"আচ্ছা, তাই করো।'' বলে সরদার সুখদেবকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

বার

সুখদেব ও কমল কয়েকদিন বৃদ্ধ মতি সরদারের অতিথি হিসাবে রইল। ইতোমধ্যে সরদারের আদেশে তাদের জন্য পৃথক ঘর তৈরী হল এবং সুখদেব নতুন বাড়ীতে উঠে গেল। পাঁচু সুখদেবের বাড়ীতেই একটি ছোট্ট কুটির তৈরী করে বসবাস করতে লাগল। সুখদেব গ্রামের সকল লোকের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে। তাদের চাষাবাদ ও পশুপালনের কাজে অংশ নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বাধা দেয়। বলে, "না, না, আপনি একাজ করবেন না। আমাদের ভাগ্যগুণে আমরা আপনার মত দেবতা পুরুষ ও কমল বোনের মত দেবীকে পেয়েছি। আমরা যত দিন রয়েছি, আপনাকে কোন

কাজ করতে হবে না।"

সুখদেবের জন্য সকলেই চাউল, তরী-তরকারী, দুধ তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে যায়। সুখদেব তাদের সঙ্গে মাঠে এবং বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। তাদের কাজ-কর্ম দেখাশুনা করে। তাদের সাথে গল্প গুজব করে। সবাই তার মধুর আলাপে মুগ্ধ। সবার হৃদয়েই তার জন্য ভক্তি-ভালবাসা জন্মে গেছে। বুড়ো মতি সরদার নিঃসন্তান। সে সুখদেবের সাথে নানা বিষয়ে পরামর্শ করে। মতি ঐ এলাকার প্রধান সরদার। প্রতি গ্রামেই একজন করে সরদার রয়েছে। তাদের সকলের ওপর প্রধান হচ্ছে মতি সরদার। নিজেদের বিচার-আচার প্রভৃতি জরুরী বিষয়ে যেসব বৈঠক হয়, তাতে মতি সরদার সুখদেবকেও সঙ্গে নিয়ে যায় এবং কোন কোন বিষয়ে সুখদেবকেই ফায়সালা করার জন্য অনুরোধ জানায়। সুখদেব কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে বিনীতভাবে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করে। সকলে খুশী হয়ে তার অভিমতের স্বপক্ষেই সিদ্ধান্তনেয়।

পার্শ্ববর্তী গ্রামে রামু সরদার নামে জনৈক ব্যক্তি খুবই প্রতাপশালী। এলাকার জনগণ মতি সরদারের পরেই রামুকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করে। সে এক সময় একটি নৈতিক অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল এবং সরদারগণের বৈঠকে তার দশ বৎসরেরনির্বাসনহয়।

মতি সরদার অত্যন্ত বুড়ো হয়ে পড়েছে। এজন্য তার স্বাস্থ্যও আজকাল ভাল যাচ্ছে না। তাই প্রথা মাফিক সে তার জীবদ্দশাতেই পরবর্তী প্রধান সরদার মনোনীত করে যাবার উদ্দেশ্যে সরদারদের একটি বৈঠক ডাকে। ঐ বৈঠকে রামুও এসে হাজির হয়। ইতোমধ্যে তার দশ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সুখদেবের কাঁধে ভর করে মতি সরদার বৈঠকে এসে বসল এবং পরবর্তী সরদার মনোনীত করার প্রস্তাব উথাপন করল। জনৈক সরদার সুখদেবের নাম প্রস্তাব করায় চারদিক থেকে তার সমর্থন শুরু হয়ে গেল। এ সময় রামু দাঁড়িয়ে বলল, "ভাইয়েরা! আপনারা সুখদেবকে প্রধান সরদার মনোনীত করতে চাচ্ছেন। এটা খুবই ভাল কথা। আমি নিজেও তাকেই উত্তম ব্যক্তি বিবেচনা করি। কিন্তু একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই যে, সুখদেব আমাদের স্বজাতি নয়। তিনি উচ্চবর্ণের সমাজ থেকে এসেছেন। তাঁর দেহে রয়েছে উঁচু জাতির রক্ত। এমতাবস্থায় তিনি আমাদের প্রধান সরদার হতে পারেন কিনা, সে বিষয়ে আগে আলোচনা করা দরকার।"

পাঁচু পাশ থেকে চীৎকার করে বলে উঠল, "তিনি এখন আমাদের সমাজে মিশে গেছেন। আমাদের নিকট কেউ অচ্ছূৎ নয়।"

চারিদিক থেকে রামুর তীব্র সমালোচনা ও হৈচৈ শুরু হল। রামুর সমর্থনেও দু'চার জন কথা বলতে চেষ্টা করল। ফলে উভয়পক্ষ নিজ নিজ লাঠি টেনে নিয়ে লড়াই শুরু করতে উদ্যত হল। বৃদ্ধ মতি সরদার দুর্বল স্বরে তাদের বিরত করতে চেষ্টা করছিল।

কিন্তু হৈচৈ ও গোলমালে তার স্বর চাপা পড়ে গেল।

এ সময় সুখদেবের গম্ভীর স্বর শোনা গেল। সুখদেব বলল, "আমার প্রিয় ভাইয়েরা! তোমরা দয়া করে আমার দু'টি কথা শোন। আমি বিদেশী ও বিজাতীয় মানুষ। এখানে এসে তোমাদের কাছে আশ্রয় পেয়েছি। তোমরা আমাকে ঘর বেঁধে দিয়েছ। আমার খাবার ও থাকার সকল ব্যবস্থা করেছ। সর্বোপরি আমি তোমাদের সকলের নিকট থেকে ভালবাসা ও সহানুভূতি পেয়েছি। আমি এর বেশী আর কিছুই চাই না। তোমাদের ভাই হিসাবে আমি তোমাদের সঙ্গে বসবাস করতে চাই মাত্র। আমার অনুরোধ তোমরা আমাকে সরদার নির্বাচন করো না। তোমাদের মধ্য থেকেই একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সরদার মনোনীত কর। আমি সর্বদাই তোমাদের নির্বাচিত সরদারের সহযোগিতা করব।"

চারদিক থেকে শব্দ উঠল, "না, না, তোমাকেই আমাদের সরদারী গ্রহণ করতে হবে।"

সুখদেব বলল, "আমি আগেই বলেছি, তোমরা যদি চাপ দাও, তাহলে আমাকে অন্যত্র চলে যেতে হবে।"

একজন সরদার বলল, "তাহলে তুমিই বলে দাও, আমাদের সরদার কে হবে?

চারিদিক থেকেই ঐ একই শব্দ প্রতিধ্বনিত হল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, তুমিই বলেদাও।"

সুখদেব সকলের মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে রামুর চেহারার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। সে যেন চোখের ভাষায় বলছে, "আমি এখানে রয়েছি। আমাকে মনোনয়ন দাও।"

সুখদেব মৃদু হেসে বলল, "যদি তোমরা আমাকে সরদার নির্বাচন করতে অনুরোধ কর, তাহলে আমি রামুর নাম প্রস্তাব করছি।"

সকলে এক বাক্যে সুখদেবের প্রস্তাব মেনে নিল। রামু সরদার নির্বাচিত হল। রামুর মাথায় প্রধান সরদারের পাগড়ী বাঁধার সময় সে মনে মনে ভাবতে লাগল, "এটা আমাকে জনপ্রিয়তা নয়, বরং আমার সরদার নির্বাচনের ভিতর দিয়ে সুখদেবেরই বিজয় প্রমাণিতহ'ল।"

তের

রামু সরদার হয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য রাতদিন পরিশ্রম করতে লেগে গেল। পাহাড়, টিলা, উপত্যকার ঝোপঝাড় কেটে সেখানে ফসলের চাষ বাড়ানোর ফলে এলাকার লোকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বেড়ে গেল। সে জনগণকে ছাগল ও মেষ পালনের পরিবর্তে গো মহিষাদি পালনে উৎসাহিত করতে লাগল। ফলে কিছুকালের মধ্যেই চাষের কাজে এসব পশুর ব্যবহার শুরু হয়ে গেলে খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে দুধ ও মাখনের যোগান বেড়ে গেল। কুটিরের পরিবর্তে এখন বড় বড় মাটির ঘর তৈরী হতে লাগল। সর্বত্রই উন্নতির ছাপ সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য যোগ্য হয়ে উঠল।

সুখদেব এসব নীরবে দেখে যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে সুখদেবের মাধব নামে একটি পুত্র এবং শান্তা নাম্নী একটি কন্যা জন্মেছে। একদিন সুখদেব নিকটের একটি উপত্যকায় গাছের ছায়ায় বসে মাধবকে নিয়ে খেলা করছিল। পাঁচু ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ রামু এসে সুখদেবের কাছে বসে পড়ল।

নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলার পর সে বলল, "ভাইয়া! আমি আমার লোকজনকে ঘৃণিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে চাই। উঁচু জাতের লোকেরা আমাদের অচ্ছূৎ করে রেখেছে। তারা আমাদের ঘৃণা করে। আমাদের সমতল ভূমি জোর জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরকে বনজংগলে ঠেলে দিয়েছে। এখানেও তারা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেয় না। মাঝে মাঝে উঁচু জাতের সৈন্যদল এসে আমাদের ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। আমাদের সম্পদ লুট করে নেয়। তারা আমাদের পশুর চেয়েও অধম বিবেচনা করে। বল, তাদের হাত থেকে কি করে আমরা রক্ষা পেতে পারি?"

সুখদেব বলল, "উত্তম! আমিও তো তাই চাই। তুমি তোমার জাতিকে একতাবদ্ধ কর। তাদের যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দাও। তাহলে উঁচু জাতের সৈনিকেরা এসে তোমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। তোমরাও তাদের মত নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা কর। সৈন্যদল গঠন কর। উঁচু জাত তখন তোমাদের সমীহ করতে বাধ্য হবে।"

রামু বলল, " তোমার কথা সত্য হতে পারে। কিন্তু ও পথে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। আমার বিশ্বাস, তাদের শক্তির মূল উৎস হচ্ছে দেবতা। তারা দেবতার পূজা করে। আর দেবতার সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকে। আমি মনে করি, আমাদেরও কোন দেবতা থাকা দরকার। দেবতার শক্তি লাভ করলে আমরা শীঘ্রই ওদের পরাস্ত করতে পারব।"

সুখদেব বলল, 'দেবতার কোন শক্তি নাই। ওটাতো পাথরের মূর্তি। একতাই আসল শক্তি।"

রামু বলল, "আমি নিজ চোখে দেবতার শক্তি দেখেছি। তুমি হয়ত শুনেছ যে, আমাকে এলাকার লোকেরা নির্বাসিত করেছিল। সে সময় আমি এক শহরের নিকটে আমাদেরই স্বজাতিদের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারা বর্ণ হিন্দুদের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। সেজন্য সমাজ তাদেরকে শহরের বাইরে অনুগত প্রজা হয়ে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছে। তারা চাষবাস করে। উঁচুজাতের লোকদের ফাই ফরমাস খাটে। তাদের কর দেয়। কিন্তু এদের ছায়া মাড়ালে উঁচু জাতের লোকদের চান করতে হয়। তারা শহরে যাবার দরকার হলে, পায়ে ঘন্টা বেঁধে যায়। ঘন্টার টুন্‌টুন্‌ আওয়াজ শুনে উঁচু জাতের লোকেরা ছোট জাতের ছায়া থেকে দূরে থাকার সুযোগ পায়। ছোট জাতের লোকেরা কোন মন্দিরের নিকট যেতে পারে না। দেবতার কীর্তন ও ভজন সংগীত শোনা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। যদি তারা শুনে, তাহলে তাদের কানে সীসা গালিয়ে ঢেলে দেয়া হয়। দেবমন্দিরের নিকট দিয়ে যাতায়াত করলে তাদের ধরে নিয়ে বলিদান করা হয়। আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, কালীদেবীর পূজা করেই তারা এত শক্তি অর্জন করেছে। আমি সিদ্ধান্ত করলাম, কালীদেবীর মূর্তি সেখান থেকে উঠিয়ে আমাদের এলাকায় নিয়ে আসব। এক রাত্রিতে আমি পা টিপে টিপে মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের প্রহরীগণ সে সময় বেহুশ হয়ে ঘুমাচ্ছিল। ধীরে ধীরে আমি মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। উঁচু বেদীর উপরে কালীদেবীর মূর্তি জিভ বের করে দাঁড়িয়েছিল। তার চেহারা সিন্দুরের রঙ্গে রাঙ্গা। প্রথমে ভয় পেলেও ধীরে ধীরে নিকটে গিয়ে দেবীর পায়ের কাছে মাথা নত করে প্রণাম করলাম। তারপর মূর্তিটি যেই উঠিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গেই মূর্তির পেছনে বাঁধা একটি সূতোর টানে ঢং ঢং করে মন্দিরের ঘন্টা বেজে উঠল। আমি পালাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু চারদিক থেকে প্রহরী ও পূজারীগণ এসে আমাকে বেঁধে ফেলল। অনেক মারপিট করার পর তারা আমাকে একটি কুঠরীতে বন্দী করে রাখল। পরদিন পূরুত ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আমাকে কালীমন্দিরে বলি দেয়ার সিদ্ধান্ত হল। দিন কেটে গেলে রাত্রির শেষাংশে তারা আমাকে কালীমন্দিরে নিয়ে গেল। হাতের বাঁধন কেটে দিয়ে দুজন প্রহরী আমাকে সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে ইশারা করল। সামনে কালীদেবী জিহ্বা বের করে রক্ত পান করার জন্য আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। এক ব্রাহ্মণ খড়গ হাতে মন্ত্র পাঠ করতে লাগল। কয়েকজন ব্রাহ্মণ আশে পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জোড় হাতে দেবীর নাম জপ করছে। জীবনের সকল আশাই শেষ। কয়েক মুহূর্ত পরেই ব্রাহ্মণের খড়গ শূন্যে উঠে আমার গর্দ্দানে নেমে আসবে! তারপরই আমার ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। আমি এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। তাই তারা সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনেই বলিদান শেষ করার জন্য ব্যস্ত ছিল। আমি স্থির করলাম মরতেই যখন যাচ্ছি, তখন মেষের মত মরব না। একটু চেষ্টা করে দেখা যাক না কেন? চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই বাঁচার আশায় দেহে প্রবল শক্তি ফিরে এলো। হঠাৎ খড়গধারী ব্রাহ্মণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার অস্ত্রটি ছিনিয়ে নিলাম এবং তা মাথার উপর তুলে ঘুরাতে ঘুরাতে সোজা দরজা অভিমুখে দৌড় দিলাম। ঘটনাটা

এত আকস্মিক ছিল যে, তারা ক্ষণিকের জন্য হতচকিত হয়ে গেল। ততক্ষণে আমি দুটো কামরা ডিঙিয়ে গিয়েছি। চারদিক থেকে শোর উঠল "ধর, ধর!" আমি মন্দির থেকে বের হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়াতে লাগলাম। পেছনে বহু লোক ছুটে আসছিল। কিন্তু তারা তখনও বেশ দূরে। রাত্রির অন্ধকার তখনও কাটেনি। ছুটছি তো ছুটছিই। দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য। কোন খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখতে পেলাম, সামনে একটি নদী। মুহূর্ত মাত্র চিন্তা না করে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরাতে লাগলাম। ব্রাহ্মণেরা যখন নদীর ওপারে এসে হাঁক ডাক শুরু করল, তখন আমি নদী পার হয়ে পুনরায় ছুটতে শুরু করেছি। কিছু দূর যাবার পরই একটি বস্তি পাওয়া গেল। সৌভাগ্য বশতঃ ওটা শূদ্রদের মহল্লা। যদিও তারা ব্রাহ্মণদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে তবু স্বজাতি বিবেচনা করে আমাকে আশ্রয় দিল। ঐ বস্তিতে কয়েকদিন লুকিয়ে থেকে কিছুটা সুস্থ হ'বার পর আমি নিজ বস্তিতে ফিরে আসি। আর ফেরার পথেই আমি সংকল্প করেছি যে, এখানেও আমি দেব-মন্দির স্থাপন করবো। আমাদের মধ্য থেকেই পূজারী ও মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত হবে। দেবতার বলে বলিয়ান হয়ে আমরা আমাদের এলাকায় উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত করবো। এখানে শহর গড়ে উঠবে। ব্রাহ্মণেরা আমাদের আর ঘৃণা করতে পারবে না। কিন্তু একাজে তোমার সহযোগিতা দরকার।"

সুখদেব বলল, "পাথরের এ দেবতার উপর আমার কোন আস্থা নেই। দেবতা মানুষে মানুষে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। দেবতা ব্রাহ্মণদের শিখিয়েছে, মানুষকে অচ্ছুৎ ঘোষণা করতে। দেবতার পূজারীগণ অচ্ছুৎ মানুষকে পশুর চেয়েও অধম বিবেচনা করে। তাই আমি তোমাদের এ সুখী সমাজে দেবতাকে টেনে এনে হিংসার বীজ বপন করতে চাইনা।"

রামু বলল, "তাহলে তুমি কথা দাও, আমি দেবমন্দির স্থাপন করলে তুমি আমার বিরোধিতা করবেনা।"

সুখদেব বলল, "না, আমি তোমার বিরোধিতাও করবো না। আমি নিজের কাজ নিয়েই সুখে আছি। তোমার কাজে সহযোগিতা বা বিরোধিতা কোনটিই আমি করবো না।"

রামু চলে যাবার পর পাঁচু সুখদেবের নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, "মহারাজ! রামু হাত নেড়ে নেড়ে আপনাকে কি বলছিল?

"সে তার নির্বাসিত জীবনের কাহিনী শোনাচ্ছিল।"

"তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি তো?"

"না,না।"

"আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, একখানি কুড়াল এনে তার মাথায় বসিয়ে দেই।"

"কেন? সে তো আমার সঙ্গে কোন অন্যায় ব্যবহার করেনি।"

"ভাল কথা, কিন্তু রামু সোজা লোক নয়। নিশ্চয় সে কোন বদ-মতলব নিয়ে এসেছিল।"

চৌদ্দ

কয়েকদিনের মধ্যেই রামু একাকী টিলার উপর একটি বেদী তৈরী করল। চারিদিক রটিয়ে দেয়া হল, অতি শীঘ্রই ওই বেদীতে এক দেবতা অবতরণ করবেন। কেউ বলল, ভোর বেলা তারা দেবতাকে নদীর ঘাটে স্নান করতে দেখেছে। স্নান শেষে দেবতা নদীতে ডুব মেরেছে। কেউবা দেবতাকে টিলার উপরের ঐ বেদীতে বসে থাকতে দেখেছে। দিন কয়েক পর একদিন রামুর তৈরী পাথরের দেবতাকে সত্যি সত্যি বেদীর উপর সমাসীন দেখা গেল। পুরুষ-স্ত্রী, ছেলে-বুড়ো সবাই দেবদর্শনে হাজির হল।

পাঁচু হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, "ভাইয়া, দেবতা এসেছে। আমি নিজ চোখে দেখে এসেছি। মানুষজন সব ওদিকে ছুটে যাচ্ছে। তুমি যাবে, চল।"

সুখদেব বলল, "ভাই পাঁচু, তুমি যাও। আমি তোমার ভেড়া-বকরীগুলো নিয়ে চরাতেযাই।"

পাঁচু বলল, "ভাইয়া, আমি জানি, দেবতা যত বড়ই হোক, তোমার চেয়ে সে বড় নয়। তুমি যদি নারাজ হয়ে থাক, তাহলে আমি আর কখনো ওমুখো হব না।"

সুখদেব বলল, "আমি নারাজ হলাম কোথায়?"

"ভাইয়া, দেবতা সম্পর্কে আমি তোমার কোন উৎসাহ দেখতে পাইনি। অনেকে তোমার নিকট এ সম্পর্কে জানতে এসেছে। কিন্তু তুমি তাদের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছ। আজ আমাকে বলতে হবে। দেবতার আসল ব্যাপারটি কি? আমার মনে হয়, তুমি কোন কিছু গোপন করছ।"

"তোমাকে কিছু বললে, তুমি তা গোপন করতে পারবে না।"

"ইচ্ছা করলে আমি গোপন করতে পারি। কিন্তু আমি কারো ভয়ে কোন কথা গোপন করতে চাই না।"

"তাহলে তোমার ওকথা শুনে কাজ নেই। বোকার মত তুমি কখন কি বলে বসবে, আর তার ফলে ফ্যাসাদ সৃষ্টি হবে।"

"না, আমাকে বলতেই হবে, ভাইয়া! আমি তোমার আদেশ কখনোই অমান্য করবো না।"

"তবে শোন, এ দেবতা আকাশ থেকে অবতরণ করেনি। এটা আগেও পাথর ছিল। এখনও পাথরই আছে। শুধু রামু ওটাকে যন্ত্রপাতি দিয়ে মানুষের আকৃতি দিয়েছে।

হ্যাঁ, তাই হবে। রামু তো সোজা মানুষ নয়। সে সকলকে বোকা বানাচ্ছে। তুমি

কথাটি ফাঁস করে দাও।

"না, আমি রামুকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমি কখনও তার দেবতার বিরোধিতা করবোনা।

সেই দিন বিকাল বেলা।

টিলায় বহু লোক সমাগম হয়েছে। রামু বক্তৃতা করে সকলকে বুঝাচ্ছিল যে, ঐ দেবতা তাদের জন্য বড় বড় মহল তৈরী করবে। এ জংগলে শহর তৈরী হবে। অত্যাচারী রাজা–মহারাজাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের রাজ্য ছিনিয়ে নেবে। সকলে দেবতার সামনে নত হয়ে প্রণাম করল। রামু আরও বলল, "দেবতাকে খুশী করলে আমাদের সকলের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। আর দেবতা নারাজ হলেই আমাদের ক্ষতি হয়ে যাবে। সকলেই প্রতিদিন সকালে এখানে ছুটে আসবে।"

পাঁচুকে টিলার দিকে যেতে দেখে সুখদেবও সেদিকে রওনা হল। পাঁচু সেখানে পৌছে কোন অঘটন ঘটাতে পারে বলে তার আশংকা ছিল। লোকজন সুখদেবকে দেখে খুশী হল। অবশ্য রামু তার সেখানে যাওয়া পছন্দ করেনি। লোকজন সুখদেবকে ঘিরে দেবতা সম্পর্কে তার মতামত জিজ্ঞেস করল। সুখদেব বলল, "তোমরা যে নতুন শক্তি লাভ করেছ সেজন্য আমি খুশী। কিন্তু—

কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ টিলার দিকে গোলমাল শোনা গেল। সুখদেব জিজ্ঞেস করল, "পাঁচু কোথায়?"

একজন বলল, "সে টিলার দিকে গেছে।

দেখা গেল কয়েকজন যুবক পাঁচুকে ধাক্কা মেরে মেরে এদিকে নিয়ে আসছে। আর তার মাথা থেকে রক্ত ঝরছে।

সুখদেব এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, ''ওর কি হয়েছে?"

রামু বলল, "তুমিই জিজ্ঞেস কর না, সে কি করেছে।"

সুখদেব পাঁচুকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি করেছিলে পাঁচু?"

সে বলল, "কিছু না ভাইয়া, আমি শুধু দেখতে গিয়েছিলাম, দেবতা মাটির তৈরী না পাথরের!"

রামু সুখদেবের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকাল। সুখদেব বলল, "পাঁচু কখনও দেবতা দেখেনি তো, সেজন্যই এ কাজ করেছে বলে মনে হয়।"

রামু বলল, "তা হতে পারে। ওকে ছেড়ে দাও। ভাইয়া সুখদেব! তুমি তাকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিও।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। পাঁচু, বাড়ী চল।"

সবাই বাড়ীর দিকে পা বাড়াল। রামু বলল, "তোমরা যাও। আমি দেবতার সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা সেরে আসি।"

* * * * * * *

রামু টিলার উপরের দিকে উঠে গেল। চারদিকে কেউ নেই। দেবতার সামনে বহু পাকা আম সাজানো রয়েছে থরে থরে। ঘরে তৈরী অন্যান্য মিষ্টান্নও দেয়া হয়েছে। দেবতার ভক্তগণই এসব দিয়ে গিয়েছে। রামু ভাল ভাল পাকা আম এবং মিষ্টি যথেষ্ট পরিমাণে গলধঃকরণ করে বলল, "দেবতা! তোমার নামে এসব মিষ্টি ও আম খেয়ে আমার পেট ভরে গেছে। আর খেতে পারছি না। তাই কিছু রইল, আর আমের আঁটিগুলোও সাজানো অবস্থায় ছেড়ে গেলাম। কাল সকালে এই আঁটিগুলো দেখে লোকে বুঝবে, তুমিই এসব সাবাড় করেছ। ব্রাহ্মণেরা তো তাই করে। তোমার নাম ভাঙিয়ে আমিও জাতে উঠতে চাই। তোমার নামেই ধন সম্পদ ও রাজত্ব কায়েম করতে চাই। তোমার অশেষ দয়া। এখন রাত অনেক হল। আজকের মত বিদায় দাও।"

রামু বাড়ীর দিকে চলে গেল। পরক্ষণেই পাঁচু একটি ঝোপের ভিতর থেকে বের হয়ে এলো। দেবতার সঙ্গে রামুর আলাপ শোনার জন্যই সে পা টিপে টিপে এসে সেখানে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। রামুর কথা শুনে সব বিষয় তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে প্রথমত টুকরীর অবশিষ্ট আম এবং মিষ্টিগুলো খেয়ে সাবাড় করল। তারপর হাতের কুঠার খানা উঠিয়ে দেবতার ঘাড়ে সজোরে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে দেবতার মুন্ডটি ভেঙ্গে হুড়মুড় করে নীচে পড়ে গেল। ঐ সময় আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল। আকাশ ঘোর কালমেঘে আচ্ছন্ন ছিল। পাঁচুর ভয় হল। হয়ত তার এসব কান্ড দেখে দেবতা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। ভয়ে ভয়ে সে বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল। ততক্ষণে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ছুটে যেতে যেতে পাঁচুর মনে হতে লাগল, যেন দেবতাও তার পেছনে পেছনে ছুটে আসছে।

পনর

আকাশ থেকে মুষল ধারে বৃষ্টি নেমে এলো। সুখদেব কুটিরে বসে চিন্তামগ্ন। মাধব ও শান্তা শুয়ে রয়েছে। কমল রান্না করছে। মাধব বলল, বাবা! আজ পাঁচু কাকা তো আসেনি।"

সুখদেব বলল, "বৃষ্টির মধ্যে হয়ত আসতে পারেনি। তুমি ঘুমাওনি এখনও?"

মাধব বলল, "শান্তা চিমটি কেটে আমাকে জাগিয়ে দিয়েছে, বাবা!"

কমল শান্তাকে ধমক দিয়ে বলল, "দুষ্টুমি করোনা শান্তা। চুপ করে ঘুমিয়ে পড়।"

সুখদেব বলল, "কমল! আমার মনে হচ্ছে, এখানে আর বেশী দিন থাকা যাবে না। দেবতা আর মন্দির নিয়ে আবার বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে। আমি যদি এখানে না এসে

তোমার স্বগোত্রীয় লোকদের সঙ্গে পাহাড় জংগলে বসবাস করতাম, তাহলে তাদের একটি উত্তম সৈন্যদলে পরিণত করে অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারতাম। কিন্তু আজ হয়ত তারা নেতার অভাবে উঁচু জাতের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।"

কমল বলল, "ওসব নিয়ে আজ কেন ভাবতে বসেছ?

সুখদেব বলল, "আমার কেন জানি কেবল মনে হচ্ছে, এখানে আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। বৃষ্টি বাদল থেমে গেলেই আমি এ জায়গা ছেড়ে পুরানো জায়গায় চলে যেতে চাই।"

কমল বলল, যেতে চাইলে যাবে, আমার তো তা নিয়ে কোন আপত্তি নেই।

এ সময় বৃষ্টির মধ্যে শপশপ করে হেঁটে পাঁচু এসে ঘরে ঢুকল। তার গায়ের কাপড় ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছে। সুখদেবকে লক্ষ্য করে সে বলল, "ভাইয়া! নদীতে বান ডেকেছে। গ্রামে জল ঢুকে পড়েছে। এখানে থাকা আর সম্ভব নয়। শীগগীর তৈরী হয়ে নাও। আমি এক্ষুনি গাধাগুলোকে সাজিয়ে নিয়ে আসছি।"

কথা কয়টি বলেই পাঁচু অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। সুখদেব দরজা খুলে বাইরে এসে দেখতে পেল মুসলধারে বৃষ্টি পড়ছে। উঠানে পানি জমা হয়ে গেছে। দূরে লোকজনের হৈ চৈ শুনা যাচ্ছে। সকলেই উপত্যকা ছেড়ে উঁচু টিলার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। কমল উঠে হাঁড়িকুড়ি বেঁধে নিল। ততক্ষণে পাঁচু তার গাধা ও বকরির পাল নিয়ে চলে এলো। গাধার পিঠে সব মাল পত্র তুলে দিয়ে তারা সকলে টিলার দিকে এগিয়ে চলল। অনেক কষ্টে উঁচু এক টিলায় উঠে একটি গুহায় তাঁরা রাত্রির মত আশ্রয় নিল।

পরদিন বৃষ্টি থেমে গেলে আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠল। কিন্তু নদীর বাঁধ ছাপিয়ে পাহাড়ী ঢলের স্রোতে সমগ্র নিম্ন এলাকা প্লাবিত হয়ে গেল। আরো কয়েকজন লোকের সহায়তায় বনের ঘাসপাতা ও ডালপালা দিয়ে পাঁচু একটি কুটির তৈরী করে ফেলল। সুখদেব ও কমল সেই কুটিরে স্থানান্তরিত হলে পাঁচু নিজে একটি গুহায় আশ্রয় নিল।

ওদিকে রামু সকালে দেবতার টিলায় গিয়ে দেখতে পেল, তার দেবমুর্তির মুন্ড নেই। সে সুখদেবকে এজন্য দোষী সাব্যস্ত করল। তার সন্দেহ হল, সুখদেব তার গোটা পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য এ জঘন্য কাজ করেছে। তাই রাত্রির অন্ধকারে একখানা দা হাতে নিয়ে সে সুখদেবের তালাশে বেরিয়ে পড়ল।

এই সময় সুখদেব ও কমল নিদ্রামগ্ন ছিল। রামু দা হাতে কুটিরে প্রবেশ করল এবং সুখদেবের মাথায় প্রচন্ড একটি আঘাত করল। বিকট চীৎকার শুনে সঙ্গে সঙ্গে কমল জেগে উঠে রামুকে পলায়নরত দেখতে পেল। সেও চীৎকার করে বলে উঠল, "কোথায় পালাচ্ছ দস্যু?" বলেই কমল ছুটে গিয়ে তার রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল। রামু একবার ক্ষেপে গিয়ে হাতের দাখানা দিয়ে কমলের ঘাড়ে আঘাত করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর আঘাত করতে তার মন সম্মত হল না। সে তাকে

জোরে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে পাঁচু ছুটে এসেছে। এসেই ব্যাপরটা বুঝতে পেরে কমলকে বলল, তুমি ভাইয়ার কাছে যাও। আমি ঐ ব্যাটাকে দেখছি। বলে সেও মুহূর্তে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রামু ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। কেউ তার পেছনে আসছে না মনে করে সে হাতের দা ফেলে দিয়ে দ্রুত গতিতে সাঁতরিয়ে চলেছে। টের পেয়ে পাঁচু তার সাঁতারের গতি আরো বাড়িয়ে দিল। রামুর বেশ কিছুটা নিকটে পৌছে সে জোরে হাঁক দিল, "দাঁড়াও, রামু! আজ তোমার পরীক্ষার দিন"

রামু পাঁচুকে দেখতে পেল। সে দেবতার টিলার দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু টিলা তখনও অনেক দূর। ওদিকে পাঁচু দ্রুত এগিয়ে আসছে। তাই সে একটু কম গভীর পানিতে মজবুত হয়ে দাঁড়াবার আশায় এদিক ওদিকে পা ঠেকানোর জায়গা তালাশ করতে লাগল। পাঁচু আক্রমণ করল। কিন্তু রামু তার লম্বা হাতের সাহায্যে পাঁচুর মাথা চেপে ধরতে চেষ্টা করল। পাঁচু টুপ করে পানির নীচে ডুবে গেল। রামু এক ফাঁকে আবার কিছুটা কম গভীর জায়গা খুঁজে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু পাঁচু তার পেছন দিক থেকে এসে পানির নীচেই পা দু'খানা জড়িয়ে ধরে হেচকা টানে তাকে পনির নীচে নিয়ে গেল এবং নিজেকে সামলে নেবার আগেই রামুর গলা টিপে ধরে পানির নীচে ডুবিয়ে রাখল। নাকমুখ দিয়ে ভরভর শব্দে পানির বুদবুদ বের হয়ে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই রামু স্থির হয়ে গেল। রামুকে ওখানে ছেড়ে দিয়ে পাঁচু পুনরায় কুটিরের দিকে ছুটে চলল। কমল সুখদেবের মাথায় পটি বেঁধে দিয়েছে। তখনও কিছু কিছু রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মাধব ও শান্তা বারবার কমলকে জিজ্ঞেস করছে "বাবার কি হয়েছে? বাবা কথ বলছে না কেন?"

পাঁচু ফিরে এসে বলল, "ভাইয়া রামুকে শেষ করে দিয়ে এসেছি।" কিন্তু সুখদেবের আঘাতের দিকে তাকিয়ে সে আঁৎকে উঠল। সুখদেবও পাঁচুর দিকে চোখ মেলে তাকাল। দু'চোখের কোন বেয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। ইশারায় সে পাঁচুকে মাধব, শান্তা ও কমলের দিকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করল। পরে কমলকে নিজের লোকদের নিকট চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করে। দুপুরের কাছাকাছি সময় সুখদেব এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদয় গ্রহণ করল।

ষোল

কমল মালপত্র গোছ গাছ করে তৈরী হয়েই বসেছিল। পাঁচু তার মেষ, বকরী ও গাধাগুলো নিয়ে এসে হাজির হল। সামান্য যা মালপত্র ছিল তা একটি গাধার পিঠে বেঁধে দিয়ে কমল শান্তাকে নিয়ে অন্য একটি গাধার পিঠে চড়ে বসল। পাঁচু ও মাধব অপর গাধাটির উপর বসে মেষ বকরীগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল। বনজংগল–পাহাড়–টিলা ডিঙ্গিয়ে কমল এক সময় সুরমা নদীর স্রোতধারা দেখতে পেল। নদীর কিনারা বরাবর তারা কয়েক দিন ধরে চলতে লাগল। পথে একটি গ্রামে জেলে ও মাঝির ঘরে তারা আতিথ্য গ্রহণ করল। জেলে তাদের সকল প্রকার যত্নসেবা করল। বুড়ো জেলে সরদার বলল, "আপনারা আমাদের সঙ্গে এ গ্রামেই বসবাস করুন। এখানে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।"

পাঁচুও তাই পছন্দ করল। গোটা গ্রামের সব নরনারী তাদের আদর আপ্যায়ন করল। কমলের স্বগোত্রীয় লোকজন কোথায় বসবাস করছে তারা তা জানেনা। এমতাবস্থায় নিজের এলাকায় ফিরে গিয়ে কোন লাভ নেই। একদিন তাই পাঁচু বলল, "বোন কমল! এ গ্রামে তো সকলেই আমাদের লোক। শহরের সভ্যতা এখানে আসেনি। দেবদ্বিজের উপদ্রবও এখানে নেই। এখানে বসবাস করলে মন্দ হয় না।"

কমল বলল, "সবই হতে পারতো পাঁচু ভাই! কিন্তু তোমার দাদার অন্তিম ইচ্ছা ছিল, ছেলে–মেয়েদের নিয়ে আমি যেন আমার নিজ বংশের লোকদের নিকট চলে যাই। তাঁর শেষ ইচ্ছা আমি কি করে অপূর্ণ রাখতে পারি?"

পাঁচু বলল, "তুমি তো কাল শুনেছ, জেলেরা বলছে তোমার জন্মস্থান যৌবনপুরে এখন শহর গড়ে উঠেছে। সেখানকার অচ্ছুৎ সমাজ উঁচু জাতের দাসত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। দাদা তো এসব খবর জানতেন না। কাজেই সেখানে গিয়ে আমাদের দাঁড়াবার জায়গা হবে কি?

কমল বলল, "যদি শহর হয়ে থাকে তবে আমি শহরের বাহিরে কোথাও ঘাস–লতা দিয়ে একটি ছোট্ট কুটির তৈরী করে নেব। তবু আমার শৈশবের খেলাধূলার স্থান, আমার স্বর্গীয় স্বামীর সঙ্গে যেখানে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে জায়গায় আমি মুখটি বুজে পড়ে থাকতে চাই।"

পাঁচু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

জেলেদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তারা আবার চলতে শুরু করল। ছয় ক্রোশ পথ চলার পর তারা একটি ছোট্ট শহরে গিয়ে পৌঁছুল। শহরটির নাম যৌবনপুর। নূতন

দালান-কোঠা, হাট-বাজার ও দেবমন্দিরের জৌলুশে সমগ্র এলাকাটি এখন আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। শহরের প্রান্তে একটি ঝিল। ঝিলের অপর পারে বস্তি।

সূর্য অস্ত যাবার আগেই পাঁচু, কমল, মাধব ও শান্তা গাধা ও মেষ-বকরী নিয়ে বস্তিতে প্রবেশ করলে কয়েকটি নেড়ী কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাদের সাদর সম্ভাষণ জানালো। বস্তির ছেলেমেয়েরা তামাশা দেখার জন্য ছুটে এলো। বয়স্ক নর-নারীরাও একে একে এগিয়ে এসে তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করল। কমল কারো প্রশ্নের উত্তর দিল না। ঝিলের নিকটে এক জায়গায় অনেকগুলো গাছ গাছড়া একত্রে দাঁড়িয়ে আছে। কমল ঐ ছায়া ঢাকা গাছগাছালি পরিবেষ্টিত জায়গাটিই পছন্দ করল।

পাঁচু পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে এলো। রাত্রিটি গাছের নীচে বিছানা পেতে কাটিয়ে দিয়ে সকালে বস্তির কয়েকজন স্বগোত্রীয় লোক নিয়ে পাঁচু ঐ জায়গায়ই দু'টি কুঁড়ে ঘর তৈরী করে ফেলল। কমল খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলো যে, তার বাবার বন্ধু রথীন সরদার বস্তির অপর প্রান্তেই বাস করে। পাঁচুর মারফত তাকে খবর দিলে রথীন সরদার এসে পরিচয় জানতে চাইলে কমল বলল, "কাকা বাবু! আমি সাধন সরদারের মেয়ে, কমল!"

রথীন অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলল, "কমল? তুমি বেঁচে আছ মা? আমরা তো মনে করেছিলাম রাজার সৈনিকেরা তোমাদের মেরে ফেলেছে।"

কমল চোখের জলে রথীনকে তার জীবনের করুণ কাহিনী শোনাল। সকল কথা শুনে রথীন সরদার বলল, "কমল! তোমার বাবা বেঁচে নেই। কিন্তু আমি তো বেঁচে আছি। তোমার কোন অসুবিধা হবে না এখানে। এখন রাজার মনোভাব অনেক বদলেছে। বিশেষ করে যৌবনপুরের নগরপতি খুবই ভাল মানুষ। তিনি এখানে আসার পর থেকে রাজার সৈনিকেরা অত্যাচার বন্ধ করেছে। শূদ্রদের প্রতি সামান্য অত্যাচার করলেও তিনি অত্যাচারীদের কঠোর শাস্তি দেন। আমরা তাদের দেবমন্দিরে যেতে পারি না বটে। কিন্তু আমাদের সেখানে যাবার কোন দরকারও নেই।

তোমার যা কিছু প্রয়োজন হয় আমাকে জানাবে। আমি সকলকেই জানিয়ে দেব যেন তারা প্রয়োজনে তোমার সাহায্য করে।

সতের

কুটিরের সামান্য দূরে ঝিল। ঝিলের ওপারেই শহর। শহরের বাসিন্দা অর্জুন ও তার স্ত্রী সাবিত্রীর একমাত্র কন্যা মোহিনী সকালে ঘুম থেকে জেগেই মাকে জিজ্ঞেস করল, " মা বাবা কোথায়?"

মা বলল, "তোমার বাবা মন্দিরে গেছে।"

"আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললে না কেন?"

"বলেছি বাছা! তুমি মুখ-হাত ধূয়ে দুধ খেয়ে মন্দিরে গিয়ে তোমার বাবাকে দেখতে পাবে। এত সকালে তুমি কি করতে সেখানে যাবে?"

"সে কথা শুনে তোমার কাজ নেই, আমি মুখ-হাত ধূয়ে আসি। তুমি দুধ নিয়ে এসো।"

সাবিত্রী দুধ নিয়ে আসতেই নগরপতির দশ বছর বয়সের ছেলে রনবীর এসে জিজ্ঞেস করল, "মোহিনী কোথায় খুড়ী মা?"

"বস, বাবা! মোহিনী হাত-মুখ ধূয়ে এখনই আসছে।"

সাবিত্রী দু'টি বাটিতে গরম দুধ নিয়ে এসে রেখে দিল। মোহিনী হাত-মুখ ধূয়ে এসে রনবীরকে দেখতে পেয়ে খুব খুশী হয়ে উঠল। মোহিনীর বয়স আট বছর। দুজনে একত্রে দুধ পান করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। মোহিনী মন্দিরে যেতে চাইলে রনবীর বলল, "ঝিলের মধ্যে অনেক পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। চল, ফুল তুলে নিয়ে মন্দিরে যাই।"

''আমি জল দেখে ভয় পাই।"

"দূর পাগলী! তুমি ঝিলে নাবতে যাবে কেন? দুরে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমিই ফুল তুলে নিয়েআসব।"

রনবীর ও মোহিনী ঝিলের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল। মাধব সে সময় ডুব দিয়ে শালুক তুলছিল। মোহিনী বলল, "রনবীর! আমি শালুক নেব।"

রনবীর ঝিলে নেমে শালুক তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

মাধব এগিয়ে এসে বলল, দাঁড়াও, আমি তুলে দিচ্ছি।"

বলতে বলতেই মাধব ডুব দিল। অনেকক্ষণ ডুবে থাকতে দেখে মোহিনী ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'বেচারা ডুবে মারা যায় নি তো? মাধব চারটি শালুক নিয়ে ভেসে উঠল। রনবীর ও মোহিনীকে মোট দুটো করে শালুক দিল। শান্তা আগেই কয়েকটি শালুক হাতে তীরে দাঁড়িয়ে ছিল।

মোহিনী বলল, "চল, রনবীর এবার আমরা বাড়ী যাই।"

মাধব ঝট পট ওপরে উঠে রনবীরকে বলল, "তুমি বাঁশী বাজাতে পার?"

রনবীর মাথা দুলিয়ে তার অপারগতা প্রকাশ করলে মাধব এক লাফে ঝিলের কিনারার একটি গাছে উঠে গেল এবং সেখান থেকে তার ঝুলন্ত জামাটি নিয়ে নীচে নেমেএলো।

জামার পকেট থেকে একটি ছোট বাঁশের বাঁশী বের করে মাধব ওতে সুর দিতেই রনবীর ও মোহিনী মুগ্ধ হয়ে গেল। মাধবের বাঁশীর সুর খুবই মধুর। তাই মোহিনী ও রনবীর তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল। মাধব তার কৃতিত্ব দেখানোর এ সুবর্ণ সুযোগে প্রতিপক্ষকে আকৃষ্ট করে ফেলল। বাঁশীর আওয়াজ শেষ হইতেই রনবীর এসে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কি?"

"মাধব।"

"তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

"ঝিলের ওপারের বস্তিতে।"

"তুমি আমাকে বাঁশী বাজানো শেখাবে?"

"শিখতে চাও? নিশ্চয়ই শেখাবো। তুমি কাল এসো।"

"এটি কে ? তোমার বোন?"

"হ্যাঁ।"

মাধব রনবীরকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কি?"

"আমার নাম রনবীর।"

"এই মেয়েটি কি তোমার বোন?"

"না, আমার বোন নয়।

"তোমরা কোথায় থাক?"

"শহরে।"

"শহর খুব সুন্দর! তাই না?"

"কেন, আমাদের শহর তুমি কোনদিন দেখ নি?"

"কোনদিনও না, পাঁচু কাকা বলে, শহরের লোক নাকি মানুষ খেয়ে ফেলে।"

"দূর পাগল! চল, আমি তোমাদের শহর দেখাবো।"

"ঠিক আছে, পাঁচু কাকাকে জিজ্ঞেস করে একদিন তোমার সঙ্গে যাব।"

মাধব বলল, "বকের বাচ্চা দেখবে?"

রনবীর বলল, "আজ নয়, কাল এসে দেখব।"

মোহিনী বলল, "আমি এখনি বকের বাচ্চা দেখব।"

অগত্যা রনবীরকেও বকের বাচ্চা দেখতে রাজী হতে হল। মাধব তাদের সঙ্গে নিয়ে ঝিলের পার্শ্বে একটি ঝোপের মধ্যে ঢুকে বকের বাসা থেকে দু'টি ছোট ছানা বের করে আনল।

মোহিনী বলল, "এখনও ওদের চোখ ফোটেনি দেখছি?"

রনবীর বলল, "তুমিও যখন ছোট ছিলে তখন তোমার চোখও এমনি বন্ধ ছিল।"

"বারবার হাঁ করছে কেন?"

মাধব বলল, "এদের ক্ষিদে পেয়েছে, খাবার চাচ্ছে।"

রনবীর বলল, "ওদের বাসায় রেখে দাও। ওর মা এসে এদের মুখে খাবার তুলে দেবে।"

মোহিনী জিজ্ঞেস করল, "রনবীর! বকের বাচ্চা কে তৈরী করেছে?"

রনবীর বলল, "ভগবান।"

মাধব জিজ্ঞেস করল, "ভগবান কে?"

মোহিনী বলল, "তুমি ভগবান কে জান না? তিনিই তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন।"

"আমাকে কে সৃষ্টি করেছে?"

"ভগবান।"

"তিনি কোথায় থাকেন?"

"মন্দিরে।"

"মন্দির কোথায়?"

"এই তো শহরে! চল তোমাকে আজ ভগবান দেখিয়ে দেব।"

"না, না, মন্দিরে দেবতা আছে। দেবতা আমাকে খেয়ে ফেলবে।"

"দূর! দেবতা আবার মানুষ খায় নাকি?"

"পাঁচু কাকা তো তাই বলে।"

"তোমার পাঁচু কাকা জঙ্গলী টঙ্গলী হবে হয়ত।"

"জঙ্গলী কাকে বলে?"

"যারা শহর দেখেনি, বন জঙ্গলে বাস করে।"

"তাহলে তো আমিও জঙ্গলী।"

"না, না, তুমি জঙ্গলী হতে যাবে কেন? তুমি আমাদের শহরের কাছেই বাস কর। তোমার গায়ের রং শহরের ছেলেদেরই মত। চল, তোমাকে শহর ও ভগবানের মন্দির দেখিয়েদেব।"

মাধব বলল, "চল যাই।"

শান্তা বলল, "আমি ঘরে চলে যাব।"

মাধব বলল, "তা যাও। আমি এদের সাথে মন্দির দেখে ফিরে আসছি।"

আঠার

রনবীর ও মোহিনীর সঙ্গে মাধব ভয়ে ভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল। শংকর ও গোপাল নামের দুজন পূজারী বাইরের আমগাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে ছিল। মন্দিরের বিশাল কামরায় দেবতাদের নানা আকৃতির মূর্তি দেখে মাধব ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "আমার খুব ভয় করছে।"

মোহিনী তাকে সাহস দিয়ে বলল, "ভয়ের কিছু নেই। দেবতারা খুব ভাল। কারো ক্ষতি করে না।"

"দেবতা ! " মাধব আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা আমাকে ভগবান দেখতে নিয়ে এসেছিলে। দেবতা কেন?"

মোহিনী বলল, "ওই দেখ, সব চাইতে যে দেবতা বেশী লম্বা তিনিই ভগবান। চল, নিকটে যাই। তুমি অনর্থক ভয় পাচ্ছ কেন?"

ধীরে ধীরে মাধব, মোহিনী ও রনবীরের সঙ্গে দেবতার কাছে গেল। দেবতার পায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "সত্যি ভগবান খুব সুন্দর! আচ্ছা, ভগবান নড়াচড়া করছে না কেন? ভগবানের শরীর ভীষন শক্ত। পাথরের তৈরী নাকি?"

মোহিনী বলল, "আহা! অমন করে বলে না। ভগবানজী রাগ করবেন। এখানে এসে মানুষ ভজন গায়। এসো আমরাও ভজন গাইব।"

"ভজন কি?"

"তুমি ভজনও জান না! আচ্ছা, তাহলে আমরা গাই। তুমি শোন।"

রনবীর ও মোহিনী মিষ্টি সুরে ভজন গাইতে শুরু করলে মাধব মনে মনে দু'একবার আবৃত্তি করার পর তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দিল। ভজন শেষে মাধব বলল, "আমি ভগবানের সামনে বাঁশী বাজাই, কেমন?"

রনবীর বলল, "আরে হ্যাঁ! বাজাও, ভগবান খুব খুশী হবেন।"

মাধব মধুর সুরে বাঁশী বাজাতে শুরু করল। ওদিকে বাঁশীর আওয়াজে ঘুমন্ত শংকর ও গোপাল জেগে উঠল। গোপাল বলল, "শংকর! এত মিঠা সুরে বাঁশী বাজায় কে?"

শংকর লাঠি হাতে মন্দিরের দিকে ছুটে যেতে যেতে বলল, "হায় হায়রে! সব নষ্ট হয়ে গেল। ঝিলের পারে যে শূদ্র ছেলেটি বাঁশী বাজায়, এটা তো তারই সুর মনে হ'চ্ছে!"

শংকর ব্যতিব্যস্ত হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করল। পেছনে পেছনে গোপালও ছুটে এলো।

www.priyoboi.com

ওদের দেখামাত্র মাধবের হাত থেকে বাঁশীটি মাটিতে পড়ে গেল। সে রনবীরের পেছনে গিয়েদাঁড়াল।

মাধবকে দেখামাত্রই শংকর ভয়ানক রেগে উঠে লাঠি উঁচু করল এবং রনবীর ও মোহিনী কোন কিছু ভাববার আগেই মাধবের মাথায় আঘাত করল। মাধব ঘুরে মাটিতে পড়ে গেল। তার মাথা থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটল। শংকর আবার লাঠি উঁচু করলে, গোপাল তাকে ধরে ফেলল। বলল, 'দেখ শংকর! এটা ভগবানের মন্দির। এখানে রক্তপাত করা মহাপাপ।"

রনবীর যদিও ছোট তবু তার গায়ে ক্ষত্রিয়ের রক্ত রয়েছে। তাছাড়া সে নগরপতির একমাত্র ছেলে। তার সামনে একজন সামান্য পূজারীর এই রকম আচরণ খুবই আপত্তিকর ছিল। সে গর্জ্জন করে উঠল, "তুমি ওকে মারলে কেন? ও তোমার কি ক্ষতি করেছে?"

পূজারী রাগের মাথায় নগরপতির ছেলেকে চিন্‌তে পারেনি। তাই বলে উঠল, "তুমিই কি তাকে এখানে নিয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ, আমিই নিয়ে এসেছি। এক্ষুণি আমি গিয়ে বাবাকে নিয়ে আসছি, দাঁড়াও। তিনি তোমার ঠাকুরগিরি বের করে দেবেন।"

শংকর বলল, "আরে নিয়ে এসো তোমার বাবাকে। তোমার বাবাকেও দেখে নেব।" বলতে বলতে সে মাধবের পা ধরে টেনে মন্দিরের বাইরে নিয়ে গেল। ভগবানের বেদী থেকে শুরু করে বাইরে আমগাছের ছায়া পর্যন্ত মাধবের ফাটা মাথার রক্তে একটি মোটা রেখা তৈরী হল। রনবীর অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে উঠল। মোহিনী অসহায়ভাবে কাঁদতে কাঁদতে সেখানে পৌছল। গোপাল ছিল পেছনে।

বাইরে গিয়ে শংকর রনবীরকে ধমক দিয়ে বলল, "তুমি কেন এ শূদ্র ছেলেকে ভগবানের মন্দিরে নিয়ে এসেছ?"

গোপাল এগিয়ে এসে রনবীরের কাঁধে হাত রেখে বলল, "এই ছেলে, তুমি পালিয়ে যাও।"

রনবীর অপমান বোধ করল। সে গর্জ্জন করে বলে উঠল, "সামান্য একজন পূজারীর ভয়ে আমি পালিয়ে যাবো? তাকে সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে আমি কিছুতেই যাবো না।" বল্‌তে বল্‌তেই একখন্ড পাথর তুলে সে শংকরের মাথাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল। পাথরের আঘাতে শংকরের মাথা কেটে গেল এবং সে দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ক্ষেপে উঠে লাঠি হাতে রনবীরের দিকে ছুটে গেল। রনবীর আরও একটি পাথর হাতে নিয়ে বলল, "আয়, এগিয়ে আয়। আর এক পা এগুলেই তোর মাথা আমি গুঁড়ো করে দেব, জংলী পূজারী কোথাকার!"

গোপাল এগিয়ে গিয়ে শংকরের হাত ধরে বলল, "চোখের মাথা খেয়েছ নাকি!

দেখতে পাচ্ছ না, ওটা কে? ওটা যে নগরপতির ছেলে।"

একথা শোনামাত্রই শংকরের হাতের লাঠি মাটিতে পড়ে গেল। তখনও সে ক্ষেপেই ছিল। কিন্তু নগরপতির ছেলের দিকে এগিয়ে যাবার তার আর সাহস হল না। বলল, আমি পুরুত ঠাকুরের কাছে গিয়ে এক্ষুণি নালিশ করব।"

গোপাল বলল, "পুরুত ঠাকুরের নিকটে নালিশ করলে কোন লাভ হবে না। উল্টো ঝিল থেকে জল টেনে এনে পুরো মন্দিরটিই তোমায় ধুইয়ে দিতে হবে। তাছাড়া আমরা যে ঘুমিয়ে ছিলাম, সে অপরাধে দুজনারই চাকরী যাবে। পুরুত ঠাকুর রামদাসের কোপ দৃষ্টিতে পড়ার চাইতে, আমাদের দুজনকেই বরখাস্ত করে, নতুন দু'জন পূজারী নিয়োগ করাই ভাল বিবেচনা করবেন। আমরা ঘুমিয়ে না থাকলে, শূদ্র ছেলে মন্দিরে প্রবেশ করতেই পারতো না। নিজের দোষ চাপা দেবে কি করে?"

শংকর এবার চুপসে গেল। রনবীর মাধবকে উঠাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার মাথা থেকে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছে।

মোহিনী নিজের ওড়না এগিয়ে দিলে রনবীর তা দিয়ে মাধবের মাথা বেঁধে দিল। তারপর তাকে ধরে নিয়ে রনবীর ও মোহিনী ঝিলের দিকে এগিয়ে চলল। ওখানে কমল অস্থিরভাবে মাধবের জন্য পায়চারী করছিল। দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে ছুটে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, "তোমরা কোথায় গিয়েছিলে? ওকি? তোকে কে মেরেছে? তোর মাথায় রক্ত কেন?"

মাধব মায়ের কোলে উঠে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মোহিনী বলল, "শংকর মেরেছে।"

"শংকর! শংকর কে?" কমল প্রশ্ন করল।

"শংকর মন্দিরের পূজারী ঠাকুর। আমরা মাধবকে ভগবানের মন্দির দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম কিনা।"

"তোমরা কে?"

"আমার নাম মোহিনী আর ও রনবীর"

"রনবীর তোমার ভাই?"

"না, আমার কোন ভাই নেই। রনবীর ও আমি এক সঙ্গে খেলা করি।"

এবার মোহিনী কমলকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি মাধবের মা?"

"হ্যাঁ, মা, আমিই ওর মা।"

"তাহলে মাধবকে আপনি বাড়ীতে নিয়ে যান। রনবীর শংকরের শাস্তি দিয়েছে। তার বাবাকে বলে শংকরকে আরও সাজা দেয়া হবে।"

কমল চোখ মুছে বলল, "এ কাপড়টি কার?"

মোহিনী বলল, "আমার ওড়না, ওটা খুলে দেবার দরকার নেই। মাধবের মাথায় বাঁধাথাক।"

"তোমার মা তোমাকে বকবে না?"

"মা কিছু বলবে না, আমি কত কিছু হারিয়ে ফেলি। আমার মা কিছু বলে না। আর ওটার জন্য কি বলবে?"

রনবীর এবার বলল, "খুড়ীমা! আমরা কাল এসে মাধবকে দেখে যাব। তার জন্য ঔষধও নিয়েআসব।"

কমল মাধবকে নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘরের দিকে রওনা হল। মোহিনী ও রনবীর শহরের দিকে চলে গেল।

কমল এক মুহূর্ত মোহিনী ও রনবীরের দিকে দৃষ্টি মেলে চাইল। চেহারা–সুরত ও গায়ের রং–এর তুলনায় মাধব ওদের চাইতেও সুদর্শন। কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। মাধব কমলের পেটে জন্মানোর দরুন আজ ঘৃনিত। যদি সুখদেব নীচজাতের কমলকে বিয়ে না করতো, তাহলে সুখদেবের সন্তানেরা সমাজের উঁচু স্তরেই বাস করতে পারত। কমলের মনে হল, তার নিজেরই জন্যে আজ তার প্রিয় সন্তান দু'টি অস্পৃশ্য হয়ে পড়েছে।

উনিশ

অর্জুন অস্থিরতার সঙ্গে ঘরের বারান্দায় পায়চারী করছিল। এক সময় স্ত্রী সাবিত্রীকে লক্ষ্য করে বলল, "মোহিনী এখনও ফিরে এলো না। তুমি বললে মন্দিরে গিয়েছে। কিন্তু মন্দিরে তো আমি ওকে দেখলাম না। গেল কোথায়?"

সাবিত্রী বলল, "যাবে কোথায়? রনবীরের সঙ্গে হয়ত বা ঝিলের কিনারায় খেলা করতেগেছে।"

"ঝিলের জলে ডুবে গেলে কেমন হবে?"

"তুমি ঘরে বসে বিড়বিড় করছ, অথচ একটু বাইরে গিয়ে দেখতেও তো পার।"

অর্জ্জুন ঘর থেকে বের হ'তে যাচ্ছিল, এমন সময় মোহিনী ও রনবীর এসে ঘরে প্রবেশ করল। অর্জ্জুন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ছিলে তোমরা?"

মোহিনী বলল, "ঝিলের কাছে গিয়েছিলাম, বাবা! বকের বাচ্চা দেখেছি। এই দেখ পদ্মফুল এনেছি। দেখ তো কত সুন্দর ফুল।"

অর্জ্জুন বলল, "হায় ভগবান! ফুল তুলতে গিয়ে যদি জলে ডুবে মরতে, তাহলে কি হ'ত?"

"আমরা তো জলে নামিনি বাবা। একটি ছেলে আমাদের ফুল তুলে দিয়েছে। ওর নাম মাধব। সবাইকে সে ফুল আর শালুক তুলে দিয়েছে। মাধব ভাল বাঁশীও বাজায়, বাবা!"

"মাধব কে?"

"ঝিলের ওই পারে থাকে।"

"হায়! হায়! ওরা তো শূদ্র! শূদ্রের হাতের ফুল অপবিত্র। ফেলে দাও, ফেলে দাও।"

মোহিনী বলল, "না, বাবা! মাধব খুব সুন্দর। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। ঝিল থেকে তাজা ফুল তুলে এনেই আমাদের হাতে দিয়েছে। ফুল কখনো অপবিত্র হয় না, বাবা।"

অর্জ্জুন ফুলগুলো টান মেরে উঠানে গরুর সামনে ফেলে দিল। বলল, "দেখছ! শূদ্রের হাতের ছোঁয়া ফুল গরুও খাচ্ছে না।"

রনবীর বলল, "কাকা বাবু! গরু তো পদ্মফুল খায় না।"

অর্জ্জুন রাগ করে বলল, "হ্যাঁ, আমাকে শেখাতে হবে না। দু'জনই শূদ্র ছেলের হাত থেকে ফুল আর শালুক নিয়ে এসেছ। ওসব ফেলে দিয়ে 'চান' করে তবে ঘরে যেও।"

সাবিত্রীকে ডেকে অর্জ্জুন বলল, "তোমার মেয়ে কি করে এসেছে দেখ। শূদ্র ছেলের তোলা ফুল নিয়ে এসেছে। ওকে 'চান' করিয়ে পবিত্র করে নিও।"

রনবীর বলল, "কাকা বাবু! মাধবকে আমরা ভগবান দেখাবার জন্য মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলাম। শংকর তার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আমিও পাথর মেরে শংকরের মাথা ভেঙ্গে দিয়েছি। বাবার কাছে বলে শংকরকে মন্দির থেকে বের করে দেব।"

অর্জ্জুন বলল, "তোমরা অপবিত্র শূদ্র ছেলেকে ভগবানের মন্দিরে নিয়ে গেলে কেন?"

"মন্দির দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"শূদ্র ছেলে মন্দিরে প্রবেশ করলে মন্দির অপবিত্র হয়ে যায় জানো না?"

মোহিনী প্রশ্ন করল, "কেন, বাবা? মাধব তো ঝিলের জলে স্নান করে পরিস্কার হাত পা নিয়েই মন্দিরে গিয়েছিল। তবু মন্দির অপবিত্র হবে কেন?"

"পাগলী মেয়ে! শূদ্র স্নান করার পরও অপবিত্রই থাকে। তারা ভগবানের মন্দিরে যেতে পারে না।"

"কেন বাবা! ভগবান ওদের সৃষ্টি করেন নি?"

"করেছেন। কিন্তু তিনিই ওদের অপবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন।"

"তাদের হাত-পা, নাক, চোখ-মুখ সবই তো আমাদেরই মত। কোথাও তো অপবিত্র কিছুই দেখা যায় না।"

"বোকা মেয়েকে বুঝানো মুশকিল! ভগবান নিজেই ওদের সমগ্র শরীরটাই অপবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন।"

"তাহলে তো ভগবান খুবই খারাপ কাজ করেছেন বাবা! শংকরের মত বদ লোককে পবিত্র আর মাধবের মত ভাল ছেলেকে অপবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এমন অন্যায় কেন করেন বাবা!"

"বোকা মেয়ে! ভগবান যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। ভগবানের কোন কাজই অন্যায় নয়। বাগানে দেখছ না, একটা গাছ বড়, আবার আর একটি গাছ ছোট। কারো গায়ের রং ফর্সা আবার কেউ বা কালো। মানুষের মধ্যেও কেউ উঁচু জাতের, আবার অনেকে নীচু জাতের। এসব ভগবানের লীলা। তুমি তা বুঝবে না। যাও, 'চান' করে এসো। আমার মাথার মগজ আর চিবিয়ে খেয়োনা।"

রনবীর বলল, "আমি কিন্তু শংকরকে দেখে নেবো কাকা বাবু।"

অর্জ্জুন বলল, "দেখ রনবীর! তুমি নগরপতির ছেলে। সামান্য একটা শূদ্র ছেলের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব মানায় না। আর কখনও তার সঙ্গে মেলামেশা করোনা, বুঝলে?"

রনবীর মাথা নীচু করে বাড়ীর দিকে যেতে যেতে চিন্তা করছিল, মাধব অপবিত্র হল কি করে? ভগবান মানুষকে দু'ভাগে সৃষ্টি করেন কেন? এক ভাগ পবিত্র আর অপরভাগ অপবিত্র। অথচ তাদের চেহারা ও দৈহিক গঠনে কোন পার্থক্য নেই। কে পবিত্র আর কে অপবিত্র, তা বুঝবার উপায় কি? শংকরের মত নির্দ্দয় মানুষ পবিত্র হল কি করে? যার অন্তরে একটি ছোট ছেলের প্রতি মোটেও দয়ামায়া নেই, সে তো নিজেই অপবিত্র। অথচ মাধব ও তার মায়ের আচরণ কত সুন্দর! তারা নাকি অপবিত্র। তার কিশোর মগজ এ সব প্রশ্নের কোনই সদুত্তর দিতে পারলো না। ভগবান, মন্দির, পুরোহিত, শংকর, মাধব এ সবই যেন তার কাছে এক দূর্বোধ্য বিষয় মনে হ'তে লাগল। মাধব ও শান্তা ভগবানের অপরূপ সৃষ্টি। তাদের দৈহিক গঠন যেমন অতি চমৎকার, তেমনি তাদের কথাবার্তাও অতি মিষ্ট। মাধব এত সুন্দর সুরে বাঁশি বাজাতে পারে, ভজন গাইতে পারে। তার গলার স্বরও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবু মাধব কেন অপবিত্র হল? কে তাকে অপবিত্র ঘোষণা করল? বিদঘুটে চেহারার শংকরই যে পবিত্র তারই বা প্রমাণ কি? রনবীর যতই চিন্তা করে ততই তার কাছে এসব হেঁয়ালী মনে হতেথাকে।

বিশ

চারটি বছর কেটে গেল। এ সময়ের মধ্যে মোহিনী এবং রনবীর সমাজের পরিবেশ থেকে বুঝতে পেরেছে যে, পূর্ব জন্মে তারা যে সব সৎ কাজ করেছিল, তারই প্রতিফল স্বরূপ এ জন্মে উঁচু জাতে তাদের জন্ম হয়েছে। আর যারা পূর্বজন্মে পাপ করেছিল, তারাই এ জন্মে শূদ্ররূপ ধারণ করে পাপ মোচন করছে।

মাধবও বুঝতে পেরেছে, সে শূদ্র। উঁচু জাতের সঙ্গে মেলামেশা করার কোন অধিকার তার নেই। সে বস্তিতে জন্মেছে। বস্তির বাইরে শহরে যাওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ। মাধব নিকটের একটি টিলার ওপর উঠে শহরের দৃশ্য দেখে। কি সুন্দর আলো ঝলমল নগরী! আর বস্তির মানুষ কি কষ্টে দিন কাটায়। রাত্রিবেলা অন্ধকারে হারিয়ে যায় ঘাসপাতার তৈরী ঘরগুলে। দূরে মন্দির দেখা যায়। ভগবানের মন্দির। ভক্তিতে তার মাথা নুয়ে আসে। ভগবানই এমন সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। নীল আকাশ, সবুজ ধরণী, কলকলগামী নদী, মনোরম পাহাড় সবই তাঁর মহান সৃষ্টি। তিনিই তো মোহিনী ও রনবীরের মত সুদর্শন বালক বালিকা তৈরী করেছেন। মাধব তাদের ভুলতে পারে না। বিশেষ করে মোহিনীর মধুর চেহারাখানি বারবার তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যদি সে শূদ্রের ঘরে না জন্মাতো তাহলে তো অবশ্যই রনবীর ও মোহিনীর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে পারতো। মাধব ভগবানের উদ্দেশ্যে মাথা নত করে বলে "ভগবান! তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছো। তোমার মহান সৃষ্টি কত সুন্দর! কত আনন্দময়! ভগবান, তুমি উচ্চ ও নীচের ভেদাভেদ দূর করে দাও। সকল মানুষই তোমার সৃষ্টি। তাদের সকলকে অবাধে মেলামেশা করার সুযোগ দাও। একমাত্র তুমিই আমাদের সকলকে সমান করে দিতে পারো।"

প্রতিদিন সে ঝিলের অপর কিনারায় গিয়ে রনবীর ও মোহিনীর আশায় দাঁড়িয়ে থাকে। তার মত অচ্ছুৎ ছেলেকে তারা ভুলে গেছে মনে করে আবার সে ফিরে যায়। তার মন বলে ওঠে "না, মোহিনী আমাকে ভুলতে পারে না।" কত যত্ন করে সে নিজের ওড়না দিয়ে সেদিন মাথা বেঁধে দিয়েছিল! মায়া–মমতার এ দেবী কি করে ভুলে যেতে পারে!

একদিন মাধব ঝিলের কিনারায় গাছের ওপর বসে শহরের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সহসা সে রনবীর ও মোহিনীকে আর কয়েকটি বালক বালিকার সঙ্গে ঝিলের দিকে

আসতে দেখল। মাধবের সমস্ত দেহ আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হচ্ছে, দ্রুত গাছ থেকে নেমে গিয়ে আগন্তুকদের সে অভ্যর্থনা জানায়। কিন্তু পরক্ষণেই তার সবকিছু স্মরণ হল। সে গাছের ঘন পাতায় ঢাকা একটি শাখায় এমন ভাবে বসে রইল যেন সেখানে বসে সে মোহিনীকে দেখতে পায়। মোহিনী ও রনবীর দলবল সহ ঝিলের নিকটে এসে হৈ চৈ করে ফুলতোলা ও সাঁতার কাটায় মেতে উঠল। মোহিনী ঝিলে নামেনি। গাছের শাখায় একটি কোকিল 'কুহু' 'কুহু' করে ডাকছিল। মোহিনীও তার সুমধুর স্বরে কোকিলের সঙ্গে সঙ্গে "কুহু" "কুহু" করতে লাগল। এক সময় সে ঝোপের নিকট আসতেই কোকিলটি উড়ে গেল। এবার মোহিনী ফিরে যেতে উদ্যত হল। মাধব তখনই মধুর সুর লহরীতে বাঁশী বাজাতে শুরু করল। মোহিনী ফিরে দাঁড়াল। বাঁশীর সুর তাকে যাদুর মত টেনে গাছের নীচে নিয়ে এলো। মোহিনী গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে বাঁশীর আওয়াজ শুনতে লাগল। আর মাধব মন প্রাণ দিয়ে বাঁশী বাজাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর বাঁশীর সুর বন্ধ হতেই মোহিনী বলে উঠল, "কে, মাধব নাকি?"

মাধব অতি দ্রুত গাছ থেকে নীচে নেমে এসে বলল, "হ্যাঁ, মোহিনী! তুমি এসেছ? আমি তোমার জন্য কতদিন থেকে পথের দিকে তাকিয়ে আছি! মনে করেছিলাম, আর হয়ত তোমার দেখাই পাব না।"

মোহিনী বলল, "আমি রনবীরকে নিয়ে আরও কয়েকবার এখানে এসেছি। তোমাকেও খুঁজেছি। কিন্তু দেখা পাইনি।"

মাধব বলল, "আমি তো মনে করেছিলাম, তুমি হয়ত কোনদিনই আমাকে তালাশ করবেনা।"

"কেন, তুমি এমনটি ভেবেছিলে কেন?"

"তোমরা শহরের উঁচু জাতের লোক, আর আমি বস্তির গরীব ছেলে।"

"তাহলে কি হয়? তুমি যে ভাল বাঁশী বাজাতে পার! শহরে তো এমন সুন্দর করে কেউ বাঁশী বাজাতে পারে না!"

"বাঁশীর সুর তোমার ভাল লাগে মোহিনী?"

"হ্যাঁ, খুব ভাল লাগে।"

ওদের কথার মাঝখানে রনবীর ঝিল থেকে উঠে ডাকতে শুরু করল, "মোহিনী! কোথায় তুমি?"

মোহিনী ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, "আমি যাই মাধব! রনবীর আমাকে ডাকছে। ওরা এখনই হয়ত চলে যাবে।"

মাধব চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, আর কোন দিন এদিকে আসবে না।?"

"তা তো বলতে পারি না," বলতে বলতে মোহিনী দৌড় দিল।

রনবীর জিজ্ঞেস করল, "ও দিকে কোথায় গিয়েছিলে?"

মোহিনী বলল, একটি পাখী গান গাইছিল। আমি সেই পাখীটিকে দেখতে গিয়েছিলাম।

"চল, এবার বাড়ী যাই।"

"চল।"

তারা সকলে শহরের দিকে পা বাড়াল। মাধব গাছে উঠে এক দৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। ওরা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাবার পর মাধবের অন্তর থেকে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস বের হয়ে এলো। বিষণ্ন মুখে গাছ থেকে নেমে ধীরে ধীরে সে বস্তির দিকে চলেগেল।

একুশ

মাধব নিজের হাতে কাদা দিয়ে ভগবানের মূর্তি তৈরী করে ঝোপের ভিতর লুকিয়ে লুকিয়ে পূজা করে, ভজন গায় এবং ভগবানকে বাঁশী বাজিয়ে শোনায়। পরপর কয়েকটি মূর্তি পরিবর্তন করে সে সকলের শেষে যেটি তৈরী করল, সেটি দেখতে খুবই সুন্দর। ভগবানের কাছে সে শুধু একটিই আবেদন বার বার পেশ করে, "হে ভগবান! তুমি সকল মানুষকে সমান করে দাও। শূদ্রদের দুরবস্থা থেকে উদ্ধার কর। মন্দিরে গিয়ে তারাও তোমার পূজা করতে এবং তোমার ভজন গাইতে চায়। তুমি তাদের সে অধিকারদাও।"

প্রায় বছর দুই পর একদিন রনবীর ও মোহিনী ঝিলের নিকট বেড়াতে এলো। সে সময় মাধব ঝোপের মধ্যে ভগবানের মূর্তির সামনে বসে বাঁশী বাজাচ্ছিল। রনবীর বলল, "কে যেন সুন্দর বাঁশী বাজাচ্ছে, তাই না?"

মোহিনী বলল, "তুমি ওকে চেন না?"

"না তো। কে ও?"

"মাধব।"

"মাধব? কোন মাধব?"

"তুমি ভুলে গেছ। যে ছেলেটিকে আমরা ভগবানের মন্দির দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। শংকর যাকে মেরেছিল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই শূদ্র ছেলেটি।"

শূদ্র কথাটি শুনে মোহিনী কিছুটা দমে গেল। ওদিকে মাধব বাঁশী বাজানো বন্ধ করে ভজন গাইতে শুরু করল। তার গলার মিষ্টি সুরে মুগ্ধ হয়ে পুনরায় রনবীর বলল, "ভজন গাইছে কে? সেই নাকি?"

মোহিনী বলল, "বোধ হয় সেই।"

রনবীর বলল, "শূদ্র ছেলে তো এমনভাবে ভজন গাইতে পারে না! চল তো, দেখে আসি।"

মোহিনী ও রনবীর ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল, একটি উঁচু বেদীর উপর একটি মূর্তি রাখা হয়েছে। চারদিকে তাজা ফুল দিয়ে বেদীটি সাজানো। তার সামনে বসে মাধব তন্ময় হয়ে ভজন গাইছে। মোহিনী ও রনবীরের পায়ের শব্দে চমকে উঠে মাধব সঙ্গীত থামিয়ে পেছনে ফিরে দুজনকে দেখে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠল। বলল, "তোমরা এসেছ? আমার পূজা তাহলে বৃথা যায়নি। ভগবান তোমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদের এখানে পাঠিয়েদেন।"

রনবীর বলল, "তোমার সংগীত শুনেই এলাম। তুমি খুব ভাল গাইতে পার দেখছি।"

"আমার গান তোমাদের পছন্দ হয়?"

মোহিনী বলল, "খুবই পছন্দ হয়, রনবীর বলছিল, আমাদের শহরেও তো এমন সুন্দর করে কেউ গাইতে পারে না।"

রনবীর জিজ্ঞেস করল, "তুমি মাধব, তাই না?"

"হ্যাঁ, তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ, দেখছি।"

"তুমি ভজন কোথায় শিখেছ?"

"তোমরাই তো আমাকে শিখিয়েছিলে!"

"কবে, কোথায়?"

"মনে নেই? ভগবানের মন্দিরে আমাকে যেদিন নিয়ে গিয়েছিলে, সেদিন!"

রনবীরের বহু কথা স্মরণ হল। সে বলল, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিন্তু সে তো অনেক দিন হল! তুমি এখনও তা মনে রেখেছ?"

"আমি তো প্রতিদিন ভগবানের সামনে এই গান গেয়ে থাকি। তাই আমি তার একটি বর্ণও ভুলিনি।"

রনবীর জিজ্ঞেস করল, "ভগবানের মূর্তি পেলে কোথায়?"

"আমি নিজের হাতে তৈরী করে নিয়েছি। এটা খুব ছোট। একটি বড় ভগবান তৈরী করব। সেটা দেখতে তোমরা আসবে?"

রনবীর ও মোহিনী কোন জবাব দিল না। মাধব বলল, "অবশ্যই এসো। আমি তো রোজ রাত্রে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে তোমাদের সুন্দর শহরটির দিকে তাকিয়ে থাকি। কাল তো সারা রাত শহরে আলো ঝলমল করছিল।"

মোহিনী বলল, "কাল যে আমাদের দীপালি উৎসব ছিল।"

"দীপালি কি?"

"ঐ তারিখে রামচন্দ্র রাবনের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে শহরে ফিরে এসেছিলেন। তার আগমন উপলক্ষে শহরের লোকেরা সারা রাত আলো জ্বালিয়ে আনন্দ উৎসব করে। সেটাই দীপালি উৎসব।"

"রামচন্দ্র কে?"

"তিনি ভগবানের অবতার।"

"অবতার কি?"

"অবতার মানুষই, তবে তার মধ্যে ভগবানের মতই শক্তি থাকে।"

"কি করে এ শক্তি আসে?"

"ভগবানের পূজা করে।"

"তাহলে আমিও ভগবানের পূজা করব। কিন্তু মা বলেন, শত পূজা করেও নাকি শূদ্র তোমাদের সমান হতে পারে না।"

মোহিনী নীরবে রনবীরের চোখের দিকে তাকাল। সে যেন রনবীরকে চোখে চোখে বলতে চাইছে, "মাধবকে এ বিষয়ে কিছু বুঝিয়ে বল।"

মাধব অস্থির হয়ে বলল, "ভগবানের দোহাই! তোমরা বল, আমি কি সারা জীবনই শূদ্র থাকব?"

মোহিনী বলল, "না, না, ভগবান অবশ্যই তোমার প্রতি দয়া করবেন।"

রনবীর বলল, "মাধব ভগবানের এ মূর্তিটি তুমি সর্বদা লুকিয়ে রেখো। কেউ যেন দেখতে না পায়। আর তোমার ভজন সংগীত খুব সাবধানে গাইবে। যদি কেউ শুনে, তাহলে তোমার ভীষণ বিপদ হবে।"

মাধব বলল, "মূর্তি তো আমি সর্বদাই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখি। কিন্তু ভজন সংগীত তো নিঃশব্দে গাওয়া যায় না।"

"আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি। অন্য কেউ শুনতে পেলে তোমার উপর অত্যাচার

করবে। চল মোহিনী, আমরা চলে যাই।"

রনবীর যেতে উদ্যত হল। মাধব মূর্তিটি ঝোপের ভিতর লুকিয়ে রেখে বনের বাইরে আসতেই শান্তা 'দাদা' বলে ডাক দিল।

মাধব বলল, "এসো শান্তা।"

শান্তা বলল, "কখন থেকে তোমাকে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

রনবীর যেতে উদ্যত হয়েও শান্তাকে দেখে ফিরে দাঁড়াল। এমন সুন্দর মুখ ও নিখুঁত গড়ন শহরের বাসিন্দাদের মধ্যেও কদাচিৎ দেখা যায়। মাধবকে জিজ্ঞেস করল, 'শান্তা কি তোমার বোন?"

মাধব বলল, "হ্যাঁ, আমার বোন।"

রনবীর বলল, "আচ্ছা আজ যাই। আবার আসব।"

শান্তা বলল, "ওরা কে, দাদা?"

"ওরা ভগবানের অবতার।"

শান্তা কিছুই বলল না। মাধব জিজ্ঞেস করল, "অবতার কি? কিছু বুঝতে পারলে?"

শান্তা বলল, "তুমি মনে কর আমি কিছুই বুঝি না। শহরের লোকদেরই অবতার বলে, তাই না?"

মাধব হেসে বলল, "দূর পাগলী। তুই যা বুঝিস তা-ই।"

বাড়ীর পথে হাঁটতে হাঁটতে মোহিনী রনবীরকে বলল, "কি ভাবছ রনুদা?"

রনবীর জবাব দিল, "মাধব আর শান্তার কথা ভাবছি। ভগবান ওদের এতো সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। উঁচু জাতের শহুরে লোকদের মধ্যে এমন মানুষ দেখা যায় না। অথচ তিনিই তাদের শূদ্রের ঘরে জন্ম দিয়ে সকলের ঘৃণার পাত্র করে দিয়েছেন। তাঁর কী অদ্ভুত খেয়াল!"

মোহিনী বলল, "আমার কিন্তু ওসব বিশ্বাস হয় না রনুদা! ভগবান এমন নির্দয় হ'তে পারেন না। মা যেমন তার সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন, তেমনি ভগবানও নিশ্চয় সব মানুষকে সমান ভালবাসেন।"

"তাহলে, তোমার কি মনে হয়, ভগবান শূদ্রদেরও ভালবাসেন?"

"নিশ্চয়ই। কেন বাসবেন না? তিনি যে সকলেরই ভগবান!"

"তবে এরা ছোট জাত হল কী করে?"

"আমার বিশ্বাস, ভগবান ওদের ছোট করে সৃষ্টি করেননি। ওদের হাত-পা সব কিছুই উঁচু জাতের লোকদেরই মত। কোথাও খুঁৎ নেই। ভগবান তাদের নাক-চোখের

কোনটাই কম দেননি। শংকরের মত হিংসুটে মানুষেরাই ওদের ছোট জাত বানিয়ে রেখেছে।"

রনবীর বলল, "হতেও পারে। বিষয়টি সম্পর্কে ভেবে দেখতে হবে।"

বাইশ

রাত্রিতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে মাধব ঘর থেকে অতি সাবধানে বের হয়ে এলো। শহরের মন্দির থেকে ঘন্টার আওয়াজ হাওয়ায় ভেসে এসে মাধবকে যেন যাদু বলে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। অতি সাবধানে চলতে চলতে সে মন্দিরের নিকটে পৌঁছে চারদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে পুনরায় এগিয়ে গেল। মন্দিরের একপাশে একটি বড় আমগাছ। মাধব অন্ধকারে আমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনল, মন্দিরে ভজন গাওয়া হ'চ্ছে। সংগীত শেষে পুরোহিত বিদায় হলো। গোপাল, শংকর এবং জনৈক আচার্য নমস্কার করে পুরোহিতকে বিদায়ী সম্ভাষণ জানালো। পুরোহিত চলে যাবার পর আচার্য, গোপাল আর শংকর মন্দির প্রাঙ্গণে তিনটি খাটিয়ায় শুয়ে গল্প জুড়েদিল।

শংকর আচার্যকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কতগুলো দেব-দেবীর মূর্তি তৈরী করেছেন।"

"প্রায়দুশো।"

"কালী মূর্তি গড়তে পারেন?"

"রামনগরের কালী মূর্তি তো আমিই তৈরী করেছিলাম। তাই দেখে, মহারাজা খুশী হয়ে আমাকে একটি হাতী উপহার দিয়েছিলেন।"

"হাতী দিয়ে আপনি কি করেন?"

"কি আর করব? হাতীটা আমার জন্য এক বিপদ হয়ে দাঁড়াল। তাই আমি ওটা মন্দিরের পুরোহিতকে দান করে দিয়েছি।"

গোপাল বলল, "রামনগরের কালী মূর্তি তো বিখ্যাত। শুনেছি সেখানে নাকি নরবলি হয়?"

"হ্যাঁ হয়, তবে শুধুমাত্র শূদ্রদের ধরে নিয়ে কালী মন্দিরে বলিদান করা হয়। কোন

উঁচু জাতের মানুষকে বলি দেয়া হয় না।"

"এখানেও হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের নগরপতি এটার ঘোর বিরোধিতা করেন। আর এ জন্যই এখানে শূদ্রদের খুব প্রতাপ। রাস্তায় দেখা হলে এরা কিছুতেই পথ ছেড়ে দেয় না। অগত্যা আপনাকেই পথ ছেড়ে দিতে হবে।"

শংকর বলল, "না, না, তা নয়। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, নীচ জাতের এসব লোকদের সঙ্গে কড়াকড়ি ব্যবহার করার কালে এরা দূর জংগলে পালিয়ে থেকে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো। কিন্তু আমাদের নতুন নগরপতি রামদাস ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার ফলে ওরা এখন লড়াই-ঝগড়া ছেড়ে দিয়ে শূদ্র হয়ে বসবাস করছে। শত্রুকে চটিয়ে দেয়ার পরিবর্ত তাকে কৌশলে বশ করে নেয়াই তো উত্তম। রামদাসের এ নীতি খুব সফল হয়েছে। শূদ্ররা বুঝতেই পারছে না, আমরা কি কৌশলে ওদের দিয়ে আমাদের গোলামী করাচ্ছি। মহারাজা তাই রামদাসের কৌশল পছন্দ করেন।"

গল্প করতে করতে তিনজনই ঘুমিয়ে পড়ল। মাধব তাদের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেল। দুই পূজারী ও এক আচার্যের আলোচনা থেকে মাধব পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারল যে, ভগবান তাদের শূদ্ররূপে সৃষ্টি করেন নি। বরং উঁচু জাতের সমাজপতিরাই চালাকি করে মানুষকে শূদ্র আখ্যা দিয়ে সমাজের দাস বানিয়ে নিয়েছে। মাধব পা টিপে টিপে মন্দিরে প্রবেশ করল। তরপর ভগবানের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আবেদন করল, "ভগবান! তুমি সকলেরই স্রষ্টা। তোমার রৌদ্র-বৃষ্টি, আলো-বাতাস নিরপেক্ষভাবে সকলেরই উপকার করে। তোমার এ দয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমরা জানি না। ব্রাহ্মণেরা তোমার মন্দির আমাদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে। আমি তোমার পূজা করতেই থাকব। তুমি আমাকে সাহায্য কর। আমি তোমার মূর্তি গড়বো। তুমি আমাকে নিষ্ঠুর সমাজপতিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা কর।"

বলতে বলতে মাধব মাথা নত করে ভগাবানকে প্রণাম করল। তারপর আরও নিকটে গিয়ে মূর্তির গায়ে হাত বুলিয়ে তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ সম্পর্কে মনে মনে একটা মাপ ঠিক করে নিলো। মন্দির থেকে বের হবার পথে একটি কাঠের বাক্সে আচার্য ঠাকুরের মূর্তি তৈরী করার যন্ত্রপাতি দেখতে পেয়ে, চট্ করে তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। সে নুয়ে বাক্স থেকে দু'তিনটি জিনিস বেছে নিয়ে পা টিপে টিপে পুনরায় মন্দির থেকে বের হয়ে গেল। পূজারী দু'জন এবং আচার্য তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

তেইশ

অর্জ্জুন বাড়ীতে এসে বলল, "কি আশ্চর্য ব্যাপার। ভগবানের মন্দির থেকে চুরি হল?"

মোহিনী ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, " কি চুরি হয়েছে বাবা?'

অর্জ্জুন বলল, "কি বলব বাছা, কালী মূর্তি তৈরী করার জন্য একজন আচার্য এসেছে। তার মূর্তি তৈরীর বাক্স থেকে কিছু যন্ত্রপাতি খোয়া গেছে।"

"কখন চুরি হল, বাবা?"

"কালরাতে।"

"তারপর?"

"সকালে আচার্য হৈ চৈ শুরু করল। সে মন্দিরের দু'জন পূজারী শংকর আর গোপালকে সন্দেহ করছে। কারণ ঐ রাত্রিতে শংকর, গোপাল আর আচার্য ছাড়া মন্দিরে নাকি কেউ আসেনি। গোপাল বলল, আচার্য অনেক সময় মিছে কথা বলে! সে নাকি দাবী করে যে, রামনগরের কালী মূর্তিটি তার হাতের তৈরী। অথচ সেটি কয়েক শত বছরের পুরাতন মূর্তি। তাই নগরপতি রামদাস তাকে তিনটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছেন। শংকর আর গোপালকেও অসতর্ক অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন।"

"কিন্তু আচার্যের এসব যন্ত্রপাতি কে চুরি করতে পারে?"

"এসব নিশ্চয়ই কোন শূদ্রের কাজ।"

"তাহলে এখন কি হবে?"

"খুঁজে দেখব, কে একাজ করেছে। যে ধরা পড়বে তাকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। শূদ্র হয়ে মন্দিরের ভিতরে যাওয়া, তার উপর আচার্যের যন্ত্রপাতি চুরি করা, এসব তো ঘোরতর অপরাধ, মা!"

মোহিনী দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল, এটা নিশ্চয়ই মাধবের কাজ। মাধবই একদিন বলেছিল, সে ভগবানের পূজা করে অবতার হবে। মোহিনী তাকেই মাটি দিয়ে ভগবানের মূর্তি তৈরী করতে দেখেছে। যদি মাধব ধরা পড়ে যায়, তাহলে সমাজের নেতারা তাকে নিষ্ঠুর ভাবে শাস্তি দেবে। আর মাধবের শাস্তি হলে তার প্রাণে বড়ই বাজবে। দিন গিয়ে রাত্রি এলো। মোহিনী শুয়ে শুয়ে কেবল মাধবের চিন্তাই করল। এক সময় চিন্তিত মনে সে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে দেখতে পেল, শংকর ও গোপাল মাধবকে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে এনেছে। সঙ্গে চুরি করা জিনিসগুলিও রয়েছে। আর রয়েছে পাথর কেটে মাধবের তৈরী করা একটি অসম্পূর্ণ

দেবমূর্তি। মন্দিরে বহু লোক জমায়েত হয়েছে। তাদের সকলেরই চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন। মাধবের মা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে আর চীৎকার করে বলছে, "আমার বাছাকে তোমরা ছেড়ে দাও। তোমাদের পায়ে ধরি। দুঃখিনীর প্রতি তোমরা দয়া কর।"

কিন্তু দয়া করতে কেউ রাজী নয়। সকলেই পুরুত ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করছে। এক সময় পুরুত ঠাকুর এলেন এবং মাধবকে মন্দিরে বলি দেওয়ার হুকুম দিলেন।

মোহিনী দেখতে পেল, শংকর মাধবকে ধরে নিয়ে মন্দিরে বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দিল। উলঙ্গ খড়্গ হাতে নিয়ে গোপাল বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। তারপর এক সময় খড়্গটি চিক্ চিক্ করে শূন্য উঠে গেল এবং পর মুহূর্তেই তা মাধবের ঘাড়ে নেমে এসে দেহটিকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

মোহিনী ভয়ে চীৎকার করে উঠল। সাবিত্রী তাকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, " কি হয়েছে মোহিনী?"

মোহিনী উঠে বসল। চোখ রগড়ে কাঁপতে কাঁপতে চারদিকে কি যেন খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ পর সে বুঝতে পারল, এটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।

সাবিত্রী বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কি হয়েছে মা! তুই অমন করছিস্ কেন?"

মোহিনী বলল, "কিছু হয়নি মা। আমি একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখলাম। এখন আর তা স্মরণ করতে পারছি না। "

কিছুক্ষণ পর মা ও মেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে রনবীর এসে বলল, "চল, মোহিনী মন্দিরে যাই।"

সাবিত্রী বলল, "একটু অপেক্ষা কর রনবীর। আমি দুধ দুইয়ে গরম করে দিচ্ছি। দুধ খেয়ে মন্দিরে যেও।" সাবিত্রী একথা বলে গাই দুইতে চলে গেল।

মোহিনী বলল, "রনুদা! একটা কাজ করে আসবে?"

"কি কাজ বলো।"

"মন্দির থেকে আচার্যের যন্ত্রপাতি চুরির খবর নিশ্চয় শুনেছ। আমার বিশ্বাস, একাজ মাধব ছাড়া আর কেউ করেনি। তুমি তাকে মাটি দিয়ে দেব-মূর্তি তৈরী করতে দেখেছ। সে ভগবানের পূজা করে অবতার হতে চায়, তাও তুমি জান।"

"হ্যাঁ জানি তো, কিন্তু তার আমি কি করতে পারি?"

"রনুদা! তুমি তাকে গিয়ে সতর্ক করে দিয়ে এসো। যদি সে চুরি করে থাকে, তাহলে তাকে অনতিবিলম্বে হাতিয়ারগুলো ঝিলের জলে ফেলে দিতে বোলো। নাহলে ধরা পড়লে তার কঠোর শাস্তি হবে।"

রনবীর চিন্তিত হয়ে উঠল। বলল, "আচ্ছা, তুমি খেয়ে নাও। আমি মাধবকে দেখে আসছি।"

ঘোড়ায় চড়ে অল্পক্ষণের মধ্যে রনবীর ঝিলের পারে পৌছল। মাধবকে কোথাও দেখা গেল না। তবে শান্তাকে একটি ঝোপের নিকট দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। রনবীর ঘোড়া থেকে নেমে শান্তার নিকটে উপস্থিত হল। শান্তা তাকে দেখে খুব খুশী হয়ে উঠল। রনবীর বলল, "মাধব কোথায় শান্তা?"

শান্তা দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, "আমি তার কি জানি?"

শান্তার চোখেমুখে আনন্দের সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখে রনবীরের ইচ্ছা হল একবার সে তার মাথার চুল টেনে দেয়। কিন্তু সে যে শূদ্র বালিকা, একথা স্মরণ হতেই রনবীর কিছুটা দমে গিয়ে বলল, "এখন দুষ্টুমী করোনা, শান্তা। আমি একটা খুব জরুরী খবর নিয়ে এসেছি। মাধবকে এখনই তা বলা দরকার। তা না হলে তার খুবই বিপদ হবে।"

শান্তা বলল, "কি করে বলি। আমাকে যে সে বলতে মানা করেছে।"

রনবীর বলল, "সে আমার কাছে বলতে নিশ্চয়ই মানা করেনি। শীগ্‌গীর বলে ফ্যাল। আমাকে এখনি আবার ফিরে যেতে হবে।"

অগত্যা শান্তা তাকে ঝোপের অপর দিকে ঘুরে গিয়ে একটি সংকীর্ণ জংগলময় পথে নিয়ে চলল। ঝোপের ভিতরে গিয়ে সে অবাক হয়ে বলল, "আরে, দাদা তো নেই। এক্ষুণি এখানে ছিল। দাদা! তুমি কোথায়?"

মাধব একটি গাছের ডালে বসে খিল খিল করে হেসে উঠল। রনবীর তাকে দেখে বলল, "নীচে নেমে এস। তোমার সাথে জরুরী কথা আছে।"

মাধব নীচে নেমে এলে রনবীর তাকে বলল, "কাল রাতে মন্দির থেকে মূর্তি তৈরী করার, যন্ত্রপাতি চুরি হয়েছে। যদি তুমি নিয়ে থাক, তাহলে তাড়াতাড়ি সেগুলো সরিয়ে ফেল। অন্যথায় ধরা পড়ে গেলে তোমার ভীষণ দূর্গতি হবে।"

মাধব বলল, "সে বিষয়ে আমাকে আর বলতে হবে না। আমি মন্দিরের পূজারীদের ভাল করেই জানি।"

রনবীর বলল, "তবু তোমাকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য মোহিনী আমাকে বারবার তাকিদ করে পাঠিয়েছে।"

"মোহিনী ও তুমি দু'জনই খুব ভাল মানুষ। তোমাদের দেখে তো ওই সমাজের মানুষের মত ভয় হয় না। আমার ভগবান দেখে যাবে না?"

বলেই সে লতাপাতা সরিয়ে পাথর কেটে তৈরী একটি মূর্তি বের করে নিয়ে এলো। রনবীর অবাক হয়ে দেখল, মূর্তিটি অত্যন্ত সুন্দর। তবে এখনও তৈরী সম্পূর্ণ হয়নি। রনবীর বলল, "আমি যাচ্ছি মাধব! তুমি ঐ মূর্তিটিও লুকিয়ে রেখো। যদি কেউ জানতে

পারে, তুমি দেবতার মূর্তি তৈরী করেছ, তাহলে কিন্তু এখানে হৈ চৈ বেঁধে যাবে।" শান্তার দিকে তাকিয়ে রনবীর বলল, "শান্তা! তুমি কখনও এ ব্যাপারে কারো সঙ্গে কিছু বলো না, বুঝলে?"

শান্তা মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল। রনবীর পুনরায় ঘোড়ায় চড়ে শহরের দিকে রওনা হয়ে গেল। মাধব ঝোপের ভিতর গিয়ে আবার পাথর কেটে মূর্তি তৈরী করার কাজে লেগে গেল। আর শান্তা পুনরায় ঝোপের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে লাগল।

চব্বিশ

প্রায় চার মাস কাল যাবৎ মাধবের তৎপরতা সম্পর্কে কমল ও পাঁচু কিছুই টের পায়নি। সে খেলাধূলার বাহানায় ঝিলের দিকে বের হয়ে যায় এবং প্রায় সারাদিন সেখানেই থাকে। পাঁচু সংসারের সকল কাজ নিজেই করে। বস্তির লোকদের নিকট সে এখন খুবই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হয়ে উঠেছে। শিকারে যাবার সময় তারা পাঁচুকে সঙ্গে নিয়ে যায়। পাঁচু প্রধানতঃ মাছ ধরা, বনে পশু শিকার এবং ভেড়া চরানোর কাজেই ব্যস্ত থাকে। পশু শিকারের উদ্দেশ্যে দূরে গেলে মাধবকে ভেড়া চরানোর দায়িত্ব দিয়ে যায়। মাধব নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভেড়া চরাতে যায়। পাঁচুর ইচ্ছা মাধব মাছ ধরা ও পশু শিকারে দক্ষ হয়ে উঠুক। কারণ, তার বিবেচনায় যুবকদের উত্তম গুণ হচ্ছে, এ দু'বিদ্যায় নিপুণতা অর্জন। মাধব নিজে তেমন আগ্রহ দেখায় না বলে পাঁচু তাকে চাপ দেয় না। তবে মাধবকে এসব বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার আকাংখাও তার মনে জাগে। একদিন সে কমলকে জিজ্ঞেস করল, "দিদি! মাধব সারাদিন বাড়ীতে বসে বসে কি করে?"

কমল বলল, "বাড়ীতে সে থাকে কই? বাড়ীতে তো সে মোটেই থাকে না। সারাদিনই ঝিলের আশে পাশে ঘুরাফিরা করে। শান্তাও মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে যায়।"

পাঁচু শান্তাকে জিজ্ঞেস করলে সেও বলল, "ঝিলের জলে রাজহাঁস সাঁতার কাটে। আমরা তাদের সাঁতার কাটা দেখি।"

ওদের কথার মাঝখানে মাধব ঘরে প্রবেশ করল। পাঁচু মাধবকেও একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। মাধব বলল, আমি ঝিলের জলে পদ্মফুল দেখি। আশে পাশের ঝোপঝাড় গুলোতে পাখীর বাসা তালাশ করি।

শান্তা ও মাধবের কথায় গরমিল হল। পাঁচু বুঝতে পারল যে, তারা কিছু একটা গোপন করছে। তাই সে এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করল না।

খানিক পরেই মাধব ঝিলের দিকে বের হয়ে গেল। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে মূর্তি তৈরী করার কাজে মনোনিবেশ করল। পাথর কেটে মসৃন করার জন্য এত গভীর মনোযোগ দিল যে, পুরোপুরি এ কাজেই সে ডুবে গেল। হঠাৎ পাঁচুও সেখানে গিয়ে হাজির হল। মাধব পাঁচুকে অতর্কিত উপস্থিত হতে দেখে একেবারে হকচকিয়ে উঠল। পাঁচু মাধবের সামনে পাথরের তৈরী দেবতার মূর্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। মাধব বলল, "কাকা! এটা ভগবানের মূর্তি। আমিই এটা তৈরীকরেছি।"

পাঁচু কোন কথা বলল না। চোখে তার আগুন জ্বলতে লাগল।

মাধব বলল, "আমি এটা তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইনি। ইচ্ছা ছিল, মূর্তিটি তৈরী সম্পূর্ণ হলে তোমাকে দেখাব। কাকা! তুমি এজন্য কি দুঃখিত হয়েছ?"

পাঁচু কিছুই বলল না। শুধু ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে বাইশাটি হাতে তুলে নিল, তারপর মূর্তিটিকে ভেঙ্গে ফেলতে উদ্যত হতেই মাধব বাইশাটি ছিনিয়ে নিয়ে পাঁচুকে টেনে মূর্তির নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিল। পাঁচু আজ প্রথম বারের মত অনুভব করল যে, সে বুড়ো হয়ে পড়েছে। তার দেহের শক্তি এখন কমে যাচ্ছে। আর অপর দিকে মাধব নবযৌবনের শক্তিতে তার চাইতে অনেক বলশালী হয়ে উঠেছে। পরাজিত পাঁচু একবার মূর্তি, আরেকবার মাধবের হাতের বাইশাটির দিকে তাকাল। মনে হল, উভয়েই যেন তার বার্ধক্যের প্রতি উপহাস করছে। অথচ তার সামনে যে যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে, দেহে রয়েছে তার সুখদেবের রক্ত এবং চেহারায় তারই পৌরুষ। অসহায় পাঁচুর দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। মাধব পাঁচুর আক্রমণ থেকে তার মূর্তিকে রক্ষা করল বটে কিন্তু তার চোখে অশ্রুর বন্যা দেখে নিজেকে আর সামলে রাখতে পারল না। অস্থির হয়ে সে পাঁচুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বলল, "কাকা! আমাকে ক্ষমা কর। আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। কাকা! আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।"

পাঁচু কয়েক মুহূর্ত আগে যে রাজত্ব হারিয়েছিল, তা ফিরে পাওয়ার অনুভূতিতে খুশী হয়ে উঠল। সে মাধবের হাত ধরে উঠিয়ে তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবা! তুমি ছোট বেলায় আমার গালে ঠাস্ করে চড় মারতে আর আমি তার বিনিময়ে তোমার নরম তুলতুলে হাতগুলিতে চুমো খেতাম। আজও তুমি আমার কাছে তেমনই আছো।"

মাধব বলল, "কাকা! আমি ভগবানের মূর্তি তৈরী করেছি। কোন খারাপ কাজ তো করিনি। তুমি অসন্তুষ্ট হলে কেন, কাকা?"

পাঁচু বলল, "মাধব! রামুও এ ভাবে ভগবানের মূর্তি তৈরী করেছিল। সে জনসাধারণকে মাটির পুতুল দেখিয়ে ধোকা দিতে চেয়েছিল। তার অন্তরে ছিল মানুষকে দাস বানানোর আকাংখা। তোমার বাবা তার কুমতলবে সহযোগিতা না করার দরুন

প্রাণ দিয়েছেন। আর সেই মূর্তি আবার তুমি তৈরী করতে লেগেছে?"

মাধব বলল, "কাকা! আমার ভগবান হিংসুক নয়। আমি এমন এক ভগবানের মূর্তি তৈরী করছি, যার চোখে সকল মানুষই সমান। আমার ভগবানের আলো বাতাস, রৌদ্র ও বৃষ্টি সকলেরই ভোগ করার অধিকার রয়েছে। তিনি দয়ার সাগর। সকলের পূজাই তিনি গ্রহণ করেন। সকলেরই প্রয়োজন পূরণ করেন। কারো প্রতি তাঁর কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব নেই।"

"কিন্তু তোমার নিজের হাতের তৈরী এক পাথরের টুকরার মধ্যে এ সব গুণ কোথা থেকেআসবে?"

"কাকা! এটা ভগবান নয়। ভগবানের মূর্তি মাত্র। সামনে কিছু একটা রেখে আসল ভগবানের পূজা করাই আমার উদ্দেশ্য।"

"সেজন্য মূর্তি তৈরী করার কি প্রয়োজন? তাঁর সৃষ্ট চন্দসূর্য্য, গাছপালা, পশুপক্ষী, নদীপাহাড়, আলোবাতাস, সবুজ ঘাস, ফলফুল, খাদ্য সামগ্রী প্রত্যেকটি তো সেই ভগবানের মহিমা ঘোষণা করছে। তুমি তাদের দেখেই তো ভগবানকে স্মরণ করতে পার। তাঁর ভজন গাইতে পার। তাঁর কাছে যা চাইবার চাইতে পার। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন ও সকলেরই প্রয়োজন পূরণ করেন। একটি ক্ষুদ্র পাথরের মূর্তিতে তাকে আবদ্ধ করতে চাও কেন?"

পাঁচুর এ বক্তৃতায় মাধবের চোখ খুলে গেল। সে যেন হঠাৎ এক মহাসত্যের সন্ধান পেল। বলল, "কাকা! আমি তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। অবোধ ছেলে মানুষ আমি। আমাকে মাফ কর। তুমি এ মূর্তিটি এখন নিজের হাতেই ভেঙ্গে ফেল।"

"না, না, তুমি নিশ্চয়ই অনেক পরিশ্রম করে এটা তৈরী করেছ। এটা ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন নেই। ঝিলের জলে ফেলে দিলেই চলবে।

"তাহলে কাকা! আমি আজ রাত্রেই এটাকে ফেলে দেবো। দিনের বেলায় কেউ হয়ত দেখে ফেলতে পারে।"

কথাবার্তা বলার পর মূর্তিটিকে লতাপাতার নীচে লুকিয়ে রেখে দু'জনেই বাড়ীর দিকে চলল। পথে মাধব বলল, "কাকা! তুমি ভগবান সম্পর্কে এত জ্ঞান কোথায় পেলে?"

পাঁচু বলল, "মাধব! আমি নেহায়েত বোকা ছিলাম। সুখদেব আমার উপর একটা বিরাট ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় আমার কোন বিষয়ে চিন্তা করার কোনই দরকার ছিল না। সকল বিষয়ে তিনিই আমাকে পথ দেখাতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তোমার ও শান্তার দায়িত্ব আমার মত নির্বোধের কাঁধে এসে পড়ে। তাই তোমাদের জন্যই আমাকে অনেক কিছু শিখতে হয়েছে। অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে হয়েছে।

পঁচিশ

সকাল বেলা নিজের কামরা থেকে বের হয়ে শংকর মন্দিরের দরজায় অতি সুন্দর একটি দেবমূর্তি দেখে চমকে উঠল। গোপাল তখনও ঘুমিয়ে ছিল। তাই এ সুখবরটি সকলের আগে নগরপতির নিকট পৌছানোর জন্য সে দৌড়াতে শুরু করল। এভাবে দৌড়াতে দেখে শহরের লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করতে লাগল, "কি হয়েছে, শংকর ঠাকুর? এত ব্যস্ত হয়ে দৌড়াচ্ছ কেন?" কিন্তু শংকরের মোটেই ফুরসৎ নেই। তার আশংকা, গোপাল জেগে উঠে দেবমূর্তিটি দেখতে পেলে নগরপতির নিকট ছুটে যাবে এবং নগরপতি তাকেই সেজন্য পুরস্কার দিয়ে ফেলবেন। সে কারুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আরও জোরে দৌড়াতে শুরু করল। অবস্থা দেখে একজন পথিকও তার পেছনে পেছনে ছুটতে ছুটতে তাকে জিজ্ঞেস করল, "শংকর! কি হয়েছে বলই না।"

কিছু দূর যাবার পর সে রনবীরকে দেখতে পেল। রনবীর তাকে থামাবার চেষ্টা করলে শংকর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রনবীর ছুটে গিয়ে তার সবল হাতে শংকরকে শক্ত করে ধরে ফেল্‌ল। বলল, "কি ব্যাপার! তুমি চুরি-টুরি করে পালাচ্ছ নাকি? তোমার পেছনে এত লোক ছুটে আসছে কেন?"

শংকর বলল, "দোহাই ভগবানের। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমার বাবার নিকট যাচ্ছি। সেখানে গিয়েই সব কথা বলব।"

রনবীর বলল, "আমার কাছে সব কথা বলার আগে তোমাকে আমি ছাড়ছি না।"

শংকর চেষ্টা করেও রনবীরের কব্জা থেকে যখন নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারলনা, তখন নেহায়েত বাধ্য হয়ে বলল, "আমি মন্দিরে দেবতার একটি নতুন মূর্তি দেখেছি। স্বয়ং ভগবান এটি রেখে গেছেন। সেই খবরটা তোমার বাবার কাছে পৌছাতে যাচ্ছি।"

ততক্ষণে আরো লোক এসে গেছে। তারা সকলে তাকে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগল। লোকজন তাকে এমনভাবে ঘিরে দাঁড়াল যে, তার ছুটে পালানোর কোন পথ রইল না। মূর্তি পাথরের না মাটির, সোনার না রূপোর সেই সব প্রশ্ন করে তার এত বিলম্ব ঘটিয়ে দিল যে, গোপাল সকলের অলক্ষ্যে শংকরের আগেই যথাস্থানে পৌছে গেল। শংকর মুক্ত হয়ে দেখল, ততক্ষণে গোপাল নগরপতির নিকট পৌছে সকল বৃত্তান্ত বলে দিয়েছে। কিছু দূর যাবার পরই শংকর নগরপতি, পুরোহিত ও অর্জ্জুনের

সঙ্গে গোপালকে ফিরে আসতে দেখল। নগরপতি জিজ্ঞেস করল, "তুমিও কি মূর্তি দেখেছ, শংকর?"

শংকর জবাবে বলল, "মহারাজ! আমিই তো ভোর রাত্রে স্বয়ং ভগবানকে মন্দিরের দরজায় মূর্তিটি রেখে যেতে দেখেছিলাম। তখন কাক পক্ষীও জাগেনি। আপনার নিকট খবর পৌছানোর জন্য ছুটে আসছিলাম। পথে লোকজনকে এ খবর বলতে বলতেই দেরী হয়ে গেল।"

গোপাল বলল, "মহারাজ! আমি তো মূর্তিটি মন্দিরের ভিতরে দেখেছি। তাহলে এখন হয়ত দেবতা স্বয়ং হেঁটেই দরজায় এসেছেন।"

নগরপতি এগিয়ে গেলেন। শংকরের কথার প্রতি তিনি কোনই গুরুত্ব দিলেন না। পুরোহিত ঠাকুর বললেন, "আমি শংকরের কথা বিশ্বাস করি না। সে সব সময় মিথ্যে কথা বলে।"

মন্দিরে পৌছে শংকর বুঝতে পারল, গোপাল অনেক শয়তানী করেছে। মূর্তিটিকে সে নিয়ে মন্দিরের ভিতরে রেখেছে। 'ভগবানের রেখে দেয়া মূর্তি'র সামনে দলে দলে নগরের লোকজন এসে সোনা রূপা দান করতে লাগল। পুরোহিত ঠাকুর ভজন গাইলেন। শংকর অনুভব করল, এ দান বন্টনের বেলায় গোপাল পুরোহিত ঠাকুরের সমান ভাগ পাবে। শংকর যদি কিছু পায়, তাহলে তা হবে অতি সামান্য।

ভিড়ের মধ্যে রনবীরও মোহিনী দাঁড়িয়ে নয়া-মূর্তি দেখছিল। রনবীর মোহিনীকে চোখের ইশারায় ভিড় থেকে বের হতে বলল। মন্দিরের এক পার্শ্বে গিয়ে রনবীর মৃদু হেসে বলল, "নতুন মূর্তির সম্বন্ধে তোমাকে একটা মজার কথা বলব।"

মোহিনী বলল, "তবে বলেই ফ্যালো।"

"এখানে নয়। ঝিলের নিকটে গিয়ে বলতে হবে। আমি সেখানে গিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। তুমি তাড়াতাড়ি এসো। মাধবের সম্পর্কেও অনেক জরুরী খবর আছে। যাবেতো?"

মোহিনীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে হাসি মুখে বলল, "ঠিক আছে, আমি এখুনি আস্‌ছি।"

রনবীর সোজা ঝিলের দিকে চলে গেল। মোহিনী ঝিলের নিকটে পৌছে রনবীরকে দেখতে পেয়ে বলল, "রনুদা! আমাদের এখন আর এভাবে চলাফেরা করা ঠিক নয়। তাই যা বলতে চাও তাড়াতাড়ি বলে ফ্যালো।"

রনবীর বলল, "আমি বলার আগে একটি জিনিস যাচাই করে নিতে চাই।"

"কি যাচাই করবে?"

"মোহিনী! আমার মনে হয় ঐ মূর্তিটি মাধবের তৈরী।"

"মাধব এত নিখুঁত মূর্তি তৈরী করতে পারবে, সেটা আমার বিশ্বাস হয় না।"

"আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে আমি কিছু প্রমাণ দেখাব।"

মোহিনী একটু ইতস্ততঃ করে রনবীরের পেছন পেছন চলল। ঝিলের অপর দিকে ঘন গাছ-পালায় ঘেরা একটি ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করে রনবীর মাধবের মূর্তি তৈরী করার স্থানটিতে পৌঁছে গেল। সেখানে গিয়ে চারদিকে ছড়ানো ছোট ছোট পাথরের টুকরোগুলো দেখিয়ে সে বলল, "মোহিনী! ভাল করে দেখ। মূর্তিটি কি এই পাথরের তৈরী নয়?"

মোহিনী কয়েকটি পাথরের টুক্‌রো হাতে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ। তাই তো মনে হচ্ছে।"

রনবীর বলল, "মূর্তিটি অসমাপ্ত থাকা অবস্থায় আমি মাধবকে এখানে বসেই সেটি তৈরী করতে দেখেছি।"

" কিন্তু ওটা মন্দিরে পৌঁছে দিল কে?"

"আমার মনে হয় মাধব ছাড়া একাজ কেউ করেনি।"

"যদি সমাজের লোক জানতে পারে যে, তারা যে মূর্তির উপর অকাতরে ধনসম্পদ ঢেলে দিচ্ছে, তা এক শূদ্র যুবকের তৈরী, তাহলে কি হবে?"

"স্থির সিদ্ধান্ত করার আগে আমি তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে নিতে চাই।"

"কিন্তু মাধবকে তুমি এখন কোথায় পাবে?"

"কাছেই তাদের ঘর। চল খোঁজ করে আসি।"

"না, রনুদা! সেখানে আমার যাওয়া উচিত হবে না।"

"তুমি দূরে দাঁড়িয়ে থেকো, তাহলে তো হবে? চল।"

ঝোপ থেকে বের হয়েই তারা বাঁশীর সুর শুনতে পেল। কিছু দূর এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, শুকনো ঘাসের স্তূপের ওপর বসে মাধব বাঁশী বাজাচ্ছে আর ভেড়াগুলো আপন মনে চরে বেড়াচ্ছে। দু'জন ধীরে ধীরে তার নিকটে গিয়ে দাঁড়াল। মাধব আপন মনে বাঁশী বাজিয়েই চলেছে। রনবীর ডাকল, "মাধব!"

বাঁশী মুখ থেকে সরিয়ে মাধব রনবীর ও মোহিনীকে দেখে লাফিয়ে উঠে বলল, "তোমরা কখন এসেছ? তাহলে তোমরা এলে! ভগবানের অশেষ কৃপা। বোসো, বোসো।"

রনবীর বলল, "না মাধব, বসবো না। একটা কথা শুধু তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই!"

"বল, কি কথা জিজ্ঞেস করতে চাও?"

"তুমি যে, মূর্তিটি তৈরী করছিলে, সেটি কোথায়?"

মাধব হকচকিয়ে গিয়ে বলল, "বোসো। আমি সব কথাই তোমাদের বলছি।"

রনবীর এদিক-ওদিক দেখে কিছু শুকনো ঘাস টেনে নিয়ে তার উপর বসে পড়ল আর কিছু ঘাস মোহিনীর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, "মোহিনী তুমিও একটু বোসো।"

মাধব জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি মন্দির থেকে সরাসরি এখানে এসেছ?"

রনবীর বলল, "হ্যাঁ।"

"তাহলে আর আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি তো সবই জানো?"

"কিন্তু মূর্তিটি মন্দিরে নিয়ে গেল কে?"

"আমিই রেখে এসেছি।"

"তুমি তো এ মূর্তির পূজা করে অবতার হ'তে চেয়েছিলে, তাই না?"

"হ্যাঁ, এক সময় চেয়েছিলাম বটে। কিন্তু এখন আর সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য মূর্তির দরকার বোধ করি না। চাঁদ-সুরুজ, পাহাড়-নদী, আলো-বাতাস, গাছ-বৃক্ষ এসবই ভগবানের নিদর্শন। ওদের দেখেই ভগবানকে ভালবাসা যায়। তাকে ভালবাসা ও ভক্তি করার জন্য নিজের হাতের তৈরী মূর্তির সামনে মাথা নত করার কোন অর্থ হয় না। তাই এ মূর্তি যাদের কাজে লাগতে পারে, তাদের নিকটেই পৌঁছে দিয়েছি।"

"যদি তারা আসল ব্যাপার জানতে পারে, তাহলে তোমার কী শাস্তি হবে, ধারণা করতে পার?"

"যদি শাস্তি দিতে চাও তো দাও। তোমরা দু'জন যে শাস্তি দেবে তা আমি মাথা পেতে মেনে নেবো। এই গোপন শাস্তির কথা অন্য কেউ কখনো তো জানতেও পারবে না।"

ইতোমধ্যে একটি কাপড়ের পুটলিতে বেঁধে শান্তা মাধবের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এলো। রনবীর ও মোহিনীকে দেখে খুশীতে তার চেহারা ফুলের মত তাজা হয়ে উঠল। রনবীরের বুকও ধক্ ধক্ করতে শুরু করল। যৌবনের জোয়ার শান্তার সমগ্র দেহে এক অতুলনীয় সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিয়েছে। সে-রূপের ঔজ্জ্বল্যে তার দরিদ্র বেশভূষাও রনবীরের চোখে মূল্যবান হয়ে উঠল। শান্তাকে একবার দেখার আগ্রহই তাকে এত দূর টেনে এনেছে। সে মোহিনীকে বলল, "তুমি একে চেন মোহিনী?"

"চিনি না! ও হচ্ছে মাধবের বোন শান্তা।"

শান্তা মাধবের কাছে চোখে চোখে অনুমতি চাইল।

মাধব বলল, "বোসো।"

শান্তা মোহিনীর পাশে বসে পড়ল। মোহিনী নারী। সে শান্তা ও রনবীরের চোখ দেখেই তাদের অন্তরের অবস্থা অনুমান করে ফেলল। সে নিজেকেও এক অদ্ভুত সংকটে দেখতেপেল।

শৈশব থেকেই রনবীরের সঙ্গে সে খেলাধূলা করে আসছে। তার মাতাপিতা এবং রনবীরের মাতাপিতার মধ্যে এ দু'জনের বিয়ের কথাবার্তাও প্রায় পাকাপাকি হয়ে রয়েছে। মোহিনী রনবীরের উপস্থিতিতে অন্য কারো চিন্তা করাও পাপ বিবেচনা করে। মাধবের প্রতিও তার মায়া অপরিসীম। কিন্তু আজ অনুভব করল, মায়ার সীমা ছাড়িয়ে মাধবের প্রতি তার আকর্ষণ যেন আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। মাধবের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই তার মনে হল, তার দৃষ্টি যেন মোহিনীর অন্তর প্রদেশে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। কিন্তু সে অস্পৃশ্য। সে একজন শূদ্র যুবক। তাকে কেন্দ্র করে কোন স্বপ্নই রচনা করা সম্ভব নয়। মোহিনী মনে মনে বলল, "হায়! মাধব যদি রনবীর হ'ত!" পরক্ষণেই এই ধরণের চিন্তা মনে উদয় হবার দরুন তার অনুশোচনা হল। বলল, "রনুদা, চল যাই।"

রনবীর আরও কিছুক্ষণ শান্তার সামনে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু মোহিনীর তাকিদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে উঠে দাঁড়াল। বলল, "মাধব! তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম, ভাই।"

মাধব বলল, "প্রতিদিনই যদি এই রকম কষ্ট দিতে, তাহলে আমি খুবই খুশী হ'তাম।"

রনবীর একটু খোঁচা দিয়ে বলল, "মোহিনী তোমার কথা খুব ভাবে কিনা, তাই আসতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

মোহিনী রনবীরের খোঁচাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, "শান্তা আজ যাই, ভাই।"

শান্তা মাধবকে বলল, "আমি বাড়ী চলে যাচ্ছি, দাদা!"

মাধব সম্মতি জানালে শান্তাও রনবীর এবং মোহিনীর পেছন পেছন রওনা হল। রনবীর জিজ্ঞেস করল, "তোমার দাদা কি এখনও পাথর কেটে মূর্তি তৈরী করে, শান্তা?"

শান্তা বলল, "এখন আর করে না, পাঁচু কাকা তাকে বারণ করে দিয়েছেন তো, তাই, দাদা ঐ কাজটা ছেড়ে দিয়েছে।"

"তোমার মা ভাল আছেন?"

"ভালই আছেন, তোমরা তার সাথে দেখা করবে?'

রনবীর মোহিনীর সম্মতি চেয়ে বলল, "যাবে মোহিনী?"

"আজ নয়। অন্য একদিন যাওয়া যাবে! রনুদা শান্তাকে নিশ্চয়ই দেখতে আসবে কি বল,রনুদা!"

রনবীর বুঝতে পারল; মোহিনী তাকে পূর্বের খোঁচাটি ফিরিয়ে দিল।

হাসিমুখে শান্তাকে বিদায় দিয়ে ওরা দু'জনে শহরের পথ ধরল।

মাধব তাদের গমন পথের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তার অন্তরে এখন প্রবল

ঝড় উঠেছে। এক সময় সে অনুভব করল, তার দু'টি পা তাকে দ্রুত শহরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রনবীর ও মোহিনীর নিকট পৌঁছতেই তার গতি শিথিল হয়ে গেল। পায়ের আওয়াজ শুনে রনবীর ও মোহিনী ফিরে দাঁড়াল। রনবীরের চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। মাধব হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। এখন সে কি বলবে, কিছুই ঠিক করতে পারছে না! রনবীর দাঁড়িয়ে দরদ ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার, মাধব? তুমি কি কিছু বলবে?"

মাধব অসহায় অবস্থায় কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আমি মোহিনীকে একটা কথা বলতে চাই।"

মোহিনীর কানের গোড়া লাল হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল, "কি বলবে, বল।"

মাধব বলর, "আমি অচ্ছুৎ। তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার খেয়াল থাকে না যে তোমরা উঁচু জাতের লোক। আমার আচরণে তুমি অসন্তুষ্ট হওনি তো?"

মোহিনী বিপাকে পড়ল। রনবীরের সামনেই মাধবের এ ধরনের প্রশ্ন সত্যই তার জন্য খুব অস্বস্তিকর ছিল। সে কি বলবে, ঠিক করতে পারল না। মাধব পুনরায় বলল, "তোমাদের মনে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা নিয়ে আমি কোন কথা বলি না। তবু, ইচ্ছা করলে তোমরা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবার মত অনেক ত্রুটিই খুঁজে পাবে।"

মোহিনী এবার কথা না বলে আর পারল না। বলল, "তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবার আমার তো কোন অধিকার নেই, মাধব।"

মাধবের বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, "এ অধিকার আমি তোমাকে দিচ্ছি, মোহিনী।" কিন্তু তা বলার মত সাহস হল না, তাই সে রনবীরকে লক্ষ্য করে বলল, "তোমাদের দেবতাকে আমি অমান্য করেছি। তবে তোমরা যে ভগবানকে স্মরণ কর, আমি তাঁকে অবশ্যই ভালবাসি। নিজের হাতে তৈরী করা মূর্তির পূজা করার চাইতে ভগবানের তৈরী দেবতার সঙ্গে প্রেম করা আমি উত্তম বিবেচনা করি। আমার বিবেচনায় তোমরা ভগবানের নিজের হাতে গড়া দেবতা। তাই আমি তোমাদের ভালবাসি। তোমরা কি এর মধ্যে কোন অশোভন আচরণ দেখতে পাচ্ছ?"

মোহিনী বলল, "মাধব! আমরা তোমার কোন আচরণই খারাপ বিবেচনা করি না।" কথাটি বলেই সে লজ্জানুভব বলল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল। বলল, "রনুদা, চল যাই।"

মাধব জিজ্ঞেস করল, "আবার তোমরা আসবে তো?"

রনবীর জবাব দিল, "কেন আসব না? সময় পেলেই তোমাকে দেখতে আসব।"

রনবীর তো আসতেই চায়। কারণ শান্তার সঙ্গে আলাপ করার তার খুবই ইচ্ছা। অবশ্য মোহিনী মনে মনে ভাবতে লাগল, এভাবে মাধবের সঙ্গে দেখাশোনা না করাই ভাল। কারণ সমাজের জাতিভেদ প্রথার সুউচ্চ প্রাচীর তাদের মাঝখানে যে অলংঘনীয় ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে, তা তাদের জন্য দুঃখ কষ্টের কারণ হতে পারে।

ছাব্বিশ

মোহিনী ও রনবীরের সঙ্গে সর্বশেষ সাক্ষাতের পর মাধব কয়েকদিন অত্যন্ত অস্থিরতার মধ্যে কাটাল। দেবমূর্তি তৈরীতে তার কয়েক মাস সময় কেটে গিয়েছিল। মনে আশা ছিল, দেবতার পূজা করে সে একদিন না একদিন অবতারই হয়ে যাবে। মোহিনীর সঙ্গে গিয়েই সে দেবমূর্তি দেখতে পেয়েছিল। মোহিনীর সংস্পর্শই তাকে ভগবানের মূর্তি গড়ার উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছিল। সে ভেবেছিল, ভগবান তার অকপট ভক্তি ও সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে একদিন পাথরের মূর্তিকে বাকশক্তি দান করবেন। মূর্তি তখন বলবে, "মাধব! তোর পূজায় আমি খুশী হয়েছি। বল, তুই কি বর চাস?" মাধব তখনই দেবমূর্তির চরণে নিজের মাথা রেখে বলবে, 'ভগবান! কিছুই চাই না। শুধু মোহিনীকে দাও।" মাধব কল্পনার চোখে দেখছিল। ভগবান যেন "তথাস্তু" বলে তার আবেদন মনজুর করলেন। তারপর সমাজের সবার কাছে দৈববাণী করে জানিয়ে দিলেন, "মাধব আমার অবতার। তাকে কেউ শূদ্র মনে করবে না।" আর এ ঘোষণার পর মোহিনীই তার কাছে ছুটে আসছে। মাধব মোহিনীকে নিয়ে এমন একটি সংসার রচনার স্বপ্ন দেখছিল, যেখানে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। উঁচু ও নীচু মর্যাদার পার্থক্য নেই। সকল মানুষই ভগবানের সৃষ্টি। তাই সবাই সমান। কিন্তু পাঁচু তার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিল। সে বুঝতে পারল, মূর্তি মাধবকে উঁচু মর্যাদায় পৌছে দিতে পারবে না। কারণ এ মূর্তিই সমাজে বিভেদ সৃষ্টির কারণ। তাই সে মূর্তিটিকে মন্দিরে পৌছে দিয়েছে।

কল্পনায় মাধব যে সুখের প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল, তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। মোহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপযোগী কোন সূত্রই আর বাকী রইল না। মনে মনে সে ভাবল, 'হায়! এই মিথ্যা স্বপ্নে ডুবে থাকাও যে অনেক ভাল ছিল।' সে শূদ্র হয়ে জন্মেছে। উঁচু জাতের নিকটে ঘেঁসার তার কোন অধিকারই নেই। অথচ তার মনের মন্দিরে মোহিনীর মূর্তি সদা সমাসীন। চরম নৈরাশ্যের মধ্যে একটি ক্ষীণ আশার আলো অবশ্যি জেগে উঠছিল। মোহিনী যাবার বেলায় তাকে বলে গেছে, সে মাধবের প্রতি অসন্তুষ্ট নয়। ভাবতে ভাবতে সে ঝিলের কিনারায় মাটির নীচে লুকোনো পাথর কাটার যন্ত্রপাতিগুলো বের করে আনল। তারপর কয়েকটি পাথরের টুকরো নিয়ে ঘরের কোণে বসে মোহিনীর মূর্তি তৈরীর কাজে লেগে গেল। পাথর কাটার খটাখট শব্দে কমল ঘরে

ঢুকে দেখতে পেল, মাধব একটি পাথরকে কেটে সুন্দর একটি তরুনীর মুখাকৃতি তৈরী করছে। মাকে দেখে মাধব বলল, "শান্তার জন্যে খেলনা তৈরী করছি, মা।"

কমল বলল, "শান্তা তো খেলনা নিয়ে বসে থাকার মত ছোট নয় মাধব! এত বড় মেয়ে, পুতুল দিয়ে কি করবে?"

মাধব বলল, "শান্তা পুতুল তৈরীর বায়না ধরেছিল, মা!"

শান্তা হঠাৎ ঠিক সেই সময়ই ঘরে এসে গেল। মাধবের হাতের পাথরটির দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল, ওটা মোহিনীর চেহারা। মুখ টিপে হেসে বলল, "হ্যাঁ মা, আমিই দাদাকে একটি পুতুল তৈরী করতে বলেছিলাম। জানো মা, দাদা ভারী সুন্দর মূর্তি তৈরী করতে পারে।"

কমল ভাবল, মাধব একটা কাজ নিয়ে সময় কাটালে মন্দ কি!

বিকালে পাঁচু ঘরে ফিরে পাথর কাটার শব্দ শুনে বলল, "দিদি! কিসের শব্দ হচ্ছে ওটা?"

কমল বলল, "শান্তা নাকি খেলা করবে। তাই মাধব তার জন্য পুতুল তৈরী করছে।"

পাঁচু ঘরে প্রবেশ করে মাধবকে অতি যত্নে পাথর ঘসে ঘসে মসৃন করার কাজে মগ্ন দেখতে পেয়ে রাগে জ্বলে উঠল। বলল, "এসব কি হচ্ছে, মাধব? শান্তা কি এখনও শিশু? তার কি পুতুল নিয়ে খেলা করা এখন আর শোভা পায়?"

মাধব বলল, "কাকু, তুমি যা ভয় করছ, আসলে তা সম্পূর্ণই অমূলক। আমি আর দেবতার মূর্তি তৈরী করছি না। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। দেবমূর্তির প্রতি আমার এখন আর কোন আকর্ষণ নেই।"

পাঁচু মাধবের কথায় পুরোপুরি আস্বস্ত না হলেও আর বাড়াবাড়ি করল না। কারণ, মাধব যা কিছুই করতে চায়, গোপনে করে না। সুতরাং আশংকার কিছুই নেই।

কয়েক দিনের মধ্যেই মাধবের মূর্তি তৈরীর নেশা এত প্রবল হয়ে উঠল যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে অবিরাম পাথর কাটা এবং মসৃন করার কাজে মগ্ন হয়ে থাকে। ক্লান্ত হয়ে গেলে বাঁশী বাজায় এবং বাঁশীর বুক থেকে একটি করুণ সুর চার ধারে কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে পড়ে। পুতুল তৈরীর কাজে মাধবের এত মনোযোগ শান্তাকেও অবাক করে দিল।

পাঁচু কখনও কখনও মাধবকে মেষ চরানো এবং মাছ শিকার করার জন্য সঙ্গে নিয়ে যায়। মাধব কাজ শেষ করে সোজা ঘরে ফিরে আসে। কয়েক সপ্তাহ পর ঘরে একটি সুন্দর পুতুল দেখে শান্তা খুব খুশী হল। সে মাধবের কানে কানে বলল, "এটা যে অবিকল সেই মোহিনী দেবী হয়ে উঠেছে, দাদা।"

মাধব আপত্তি করে বলল, "না, না, এটা অবিকল মোহিনীর মত হয়নি শান্তা! আমি আরও একটি মূর্তি তৈরী করব। সেটি তৈরী করতে আমি আমার সমস্ত শক্তি কাজে

www.priyoboi.com

লাগাব,দেখিস।

ঠিক পরের দিনই মাধব অন্য একটি নতুন পাথর কেটে মূর্তি তৈরীর কাজে লেগে গেল।

সাতাশ

রনবীর ও মোহিনীর বয়সে মাত্র দু'বছরের ফারাক। শৈশব থেকে দু'জনে একত্রে খেলাধূলা করে এসেছে। একই গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ করেছে। তাদের মাতাপিতা রনবীরের সাথে মোহিনীর বিয়ে ঠিক করেই রেখেছেন। তারা দুজনেই দুজনকে ভালভাবে জানে এবং গভীরভাবে ভালবাসে। অদূর ভবিষ্যতে তাদের বিয়ে প্রায় সুনিশ্চিত বিধায় যৌবনের কোঠায় পা দেয়ার পরও তাদের মেলামেশায় কেউ আপত্তি করে না। রনবীর সুদর্শন, সাহসী ও বুদ্ধিমান যুবক। সে মোহিনীকে অন্তর দিয়েই ভালবাসে। কিন্তু শান্তার আবির্ভাব কেন যে তার মনে রেখাপাত করল, তা সে অনুমান করতেই পারে না। নানান ছলছুতায় আজকাল সে ঝিলের ধারে ঘুরে বেড়ায়। মাধবের সঙ্গে গল্প করে। শান্তা এলে তার মনে এক নতুন সুর বেজে ওঠে। পাঁচুর সঙ্গেও দু' একদিন রনবীরের দেখা হয়েছে। পাঁচু উঁচু জাতের কোন মানুষকেই ভাল চোখে দেখে না। কিন্তু রনবীরকে সে খুবই পছন্দ করে! রনবীরের পোশাক পরিচ্ছদ হবহু সুখদেবের মত। সুখদেবেরই ভঙ্গিমায় তার কোমরে তরবারি ঝোলে। তাকে সেদিন পাঁচু জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনি কি রাজার সেনাপতি?" রনবীর বলেছিল, "না, পাঁচু কাকা! আমার বাবা ছিলেন সেনাপতি। এখন অবশ্যি তিনি অবসর নিয়েছেন। এই শহরের নগরপতিও তিনিই।"

"তাহলে তো আপনার বাবা ছোট জাতের মানুষদের খুব ঘৃণা করেন?"

"তিনি এখন তাদের প্রতি সব রকম দূর্ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন।"

"শুনেছি, গঙ্গারাম নামে রাজার এক সেনাপতি আছেন। তিনি নাকি শূদ্রদের প্রতি খুব অত্যাচার করেন।"

"সে তো অনেক দিন আগে মারা গেছে, আমার জন্মের আগেই তাকে এক বীর পুরুষ হত্যা করেছে।"

"সে বীর পুরুষটি কি শূদ্র ছিলেন?"

"রনবীর মাথা নেড়ে বলল, না, পাঁচু কাকা, তিনি শূদ্র নন। তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়। তাঁর নাম সুখদেব। আমার পিতার বিশেষ বন্ধু ছিলেন তিনি।"

"আপনার পিতাজীর নাম কি রামদাস?"

"ঠিক তাই, কিন্তু, আপনি কি করে জানলেন?"

"লোক মুখে শুনেছি।"

সেই দিনই পাঁচু সুখদেবের মুখে রামদাসের সকল কাহিনী শুনেছিল। এখন সাত পাঁচ ভেবে সে কথা সে চাপা দিল।

রনবীর পাঁচু ও মাধবের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ঝিলের পাশে গেল। সেখানে সে শান্তাকে কলসী ভরতে দেখে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠল। এতক্ষণ সে তারই জন্য ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করছে। কাছে যেতেই শান্তা কলসীটি মাটিতে রেখে একটি গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। রনবীর বলল, "শান্তা! তোমার জন্যই আমি এতক্ষণ অপেক্ষা করছি।

শান্তা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে লাজুক মুখে বলল, "মোহিনী ভাল আছে?"

"ভাল আছে। তোমার কথা সে বার বার বলে।

রনবীর এগিয়ে গিয়ে শান্তার মুখোমুখি দাঁড়াল। বলল, "তোমার দাদা আজকাল কি করেশান্তা!"

"মূর্তি তৈরী করে। দাতা মোহিনীর তিন খানি মূর্তি গড়েছে। একখানি তো অবিকল মোহিনীর মতই হয়েছে।"

একজন শূদ্র মোহিনীর মূর্তি তৈরী করছে–এটা রনবীরের কাছে খুবই আপত্তিকর বলে মনে হল। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভেবে দেখল, মাধব ও মোহিনীর মধ্যে রনবীরই যোগাযোগ করে দিয়েছে। নইলে তাদের দেখা সাক্ষাতও হয়ত ঘটতো না। তাছাড়া, সে নিজে গত কয়েকদিনে শান্তার সঙ্গে যেভাবে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে, তা কোনদিক দিয়েই বৈধ নয়। এ শূদ্র বালিকাকে সে কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না। মোহিনীই তার ভবিষ্যৎ জীবন সঙ্গিনী। এমতাবস্থায় শান্তার সঙ্গে এই মেলামেশা কপটতা ছাড়া কিছুই নয়। যদি সে শান্তার সান্নিধ্য লাভের জন্য বারবার ঝিলের নিকট ছুটে আসতে পারে, তাহলে মাধবের মোহিনীর মূর্তি গড়ায় অপরাধ কি?

শান্তার আকস্মিক প্রশ্নে রনবীরের চিন্তায় ছেদ পড়ল। শান্তা প্রশ্ন করল, "মোহিনী কি আপনারবোন?"

"না তো।"

তবে আপনার সাথে তার সম্পর্ক কি?"

"তার বাবা আমার বাবার বন্ধু, ব্যস্।"

এ সময় শংকরকে দ্রুত ধাবমান একটি গাভীর লেজ ধরে পেছনে পেছনে ছুটে এই দিকে আসতে দেখা গেল। শান্তা কলসীটি কাঁখে তুলে নিয়ে বলল, "আমি যাই।"

রনবীর বলল, "যাবে? ঠিক আছে। আবার দেখা হবে।"

শংকর বহু চেষ্টা করেও গাভীর গতিরোধ করতে পারল না। অবেশেষে ওটাকে ছেড়ে দিয়ে সে রনবীরের নিকটে এসে বলল, "গরুটা বড় পাজী। আরে আপনি এখানে!"

রনবীর বলল, "এসেছিলাম তো শিকারের জন্যে। কিন্তু তোমার মুখ দেখলে তো শিকার মিলবে না। তাই এখন ফিরে যেতে হচ্ছে।"

শংকর রসিকতা করে বলল, "শিকার তো ঐ চলে যাচ্ছে।"

"কই?"

শংকর শান্তার দিকে ইশারা করে বলল, "ঐ যে, ঝিলের পাড়ে, ঝোপের আড়ালে কলসী কাঁখে হারিয়ে যাচ্ছে।"

রনবীর বলল, "তুমি না ব্রাহ্মণ! এমন অশ্লীল উক্তি করতে তোমার লজ্জা হয় না?"

শংকর বলল, "রাগ করবেন না বাবু! আমি একটু রসিকতা করলাম মাত্র।"

রনবীর বলল, "রসিকতা করার জন্যেও মগজ লাগে। ভগবান তোমার মাথায় ঐ জিনিসটি একবিন্দুও বরাদ্দ করেননি, বুঝেছ।"

শংকর বিড় বিড় করে কি সব বলতে বলতে মন্দিরের দিকে রওনা হয়ে গেল। রনবীরও বাড়ীর পথ ধরল।

আঠাশ

শান্তা ও কমল রান্নার কাজে ব্যস্ত, ঠিক এমনি সময় বাইরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেয়ে কমল জিজ্ঞেস করল, "ঘোড়ায় চড়ে কে গেল?"

শান্তা জবাব দিল, "আমি জানিনে তো, মা!" বলেই খানিকক্ষণ সে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে রইল।

কমল কিছুই ঠাহর করতে পারল না।

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ ধীরে–ধীরে দূরে মিলিয়ে যেতেই শান্তা উদ্বিগ্ন মুখে বলল, "আমি চান্ করে আসি মা?"

কমল বিস্মিত হয়ে বলল, "সকালে একবার চান্ করে এলি যে?'

শান্তা বলল, "বড্ড গরম লাগছে মা!"

কমল ভাবল রান্নার কাজে সাহায্য করতে গিয়ে ওর হয়ত গরম লেগেছে। তাই ভেবে সে বলল, 'যাবি যা, চান সেরে তাড়াতাড়ি করে চলে আসিস। দেরি করিস নে যেন।'

শান্তা ধীরে উঠে একটি কাপড় হাতে নিয়ে ঝিলের দিকে চলে গেল। মায়ের চোখের আড়াল হ'তেই সে রীতিমত দৌড়াতে শুরু করল। রনবীর তখন একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে শান্তার জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

শান্তা তার নিকট পৌছতেই সে বলল, "তুমি এসেছ শান্তা? কি করে বুঝলে যে, আমি এখানে এসেছি?'

"আমি আপনার ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছি। আপনি আমাদের ঘরের পাশ দিয়ে এলেন না?'"

"এলাম তো, তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়নি তো?"

"ক্ষতি হবে কেন? আমি বলছি যে, আপনি আমাকে ইঙ্গিতে ডাকার জন্যই ওদিকে গিয়েছিলেন, ঠিক তাই না?'

"তা হবে হয়ত। আচ্ছা, তোমাদের ঘরে ঐ সময় কে কে ছিল?'

"কাকা ও দাদা তো শিকারে গেছে। শুধু মা আর আমি ঘরে ছিলাম। মা ঘোড়ার শব্দ শুনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘোড়ায় চড়ে কে গেল? আমি জানতাম তাও মাকে বলিনি। বলেছি, আমি জানি না।"

"এখন এলে কেমন করে?"

"মাকে বলেছি, চান করতে যাচ্ছি।"

"ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেই তুমি ছুটে এলে?"

শান্তা হাসি মুখে প্রশ্ন করল, "এদিকে আপনি কেন আসেন, বলুন তো?"

"তা তো জানিনা।" রনবীর জবাব দিল, ''তবে না এসে যে পারি না। সমস্তই জানি, তোমার ও আমার মাঝখানে সমাজের উঁচু দেয়াল দাঁড়িয়ে রয়েছে। তোমার সঙ্গে আমার এভাবে মেলামেশা সমাজ কিছুতেই রবদাশ্ত করবে না। তবু কেন যে আসি, তা তো বলতে পারিনে, শান্তা!"

"আমি ছোট জাতে জন্মেছি। আমার তো বামণ হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো শোভা পায় না। তবু আপনি আমাকে প্রশ্রয় দিয়ে সাহস বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন তো

আপনার সাক্ষাৎ না পেলে আমারও মন চঞ্চল হয়ে ওঠে।"

"হ্যাঁ, তাই আমি ভাবছি। এ ধরণের মেলামেশা আমাদের বন্ধ করাই দরকার! মনে কর, আমি যদি আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে না আসি, তাহলে তুমি কি খুব দুঃখ পাবে?'

শান্তা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "ও প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে আপনার মানসম্ভ্রম নষ্ট হলে আপনি যা ভাল মনে করেন, তাই করবেন। আমার কথা আপনি ভাববেন কেন?"

হঠাৎ ঘাস পাতার ভিতর থেকে সবুজ বর্ণের একটি চলন্ত জীব মাথা উঁচু করতেই শান্তা চমকে উঠে রনবীরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। পরক্ষণেই শান্তার মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল। রনবীর হতচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে শান্তা! তুমি অমন করছ কেন?"

"একটা সাপ আপনাকে দংশন করতে যাচ্ছিল।"

রনবীর পলায়মান সাপটিকে দেখতে পেয়ে বলল, ওটাতো খুব বিষাক্ত সাপ, দেখছি।"

শান্তা বলল, "আমি তাই শুনেছি। ওই সবুজ রঙ্গের সাপ ঘাস পাতার মধ্যে মিশে থাকে। যাকে কামড়ায় তার নাকি খুব ঘুম পায়। আর কোনদিনই সে জেগে ওঠে না।।"

"তোমার যেচোখ বন্ধ হয়ে আসছে! তাহলে সাপটি কি তোমাকে কামড়েছে?"

'হ্যাঁ।'

"কোথায়?"

শান্তা পায়ের একটি জায়গার দিকে অংগুলি নির্দেশ করল। রনবীর দেখতে পেল, তার পায়ের একটি জায়গা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

রনবীর বলল, "শান্তা, তুমি কি নিজের জীবন দিয়ে আমাকে রক্ষা করলে?"

শান্তা ম্লান হেসে বলল, 'যদি আপনার কোন উপকারে এসে থাকি, তাহলে তো জন্ম সার্থকহল।'

"না, না, তা হতে পারে না। চল, ঘরে চল। আমি তোমার জন্যে সাপুড়ে নিয়ে আসব।"

"আপনি যদি আমার সঙ্গে দেখাই করতে না আসেন, তা হলে আমার বেঁচে থাকার কি দরকার? তার চাইতে আপনার পদতলে আমার মৃত্যুই কাম্য।"

"না, শান্তা! আমি বারবার আসব। তোমার এ জীবন এভাবে বিলিয়ে দেয়া চলবে না।"

শান্তা ক্রমেই নির্জীব হয়ে পড়তে লাগল। রনবীর সকল সংকোচ কাটিয়ে তাকে

পাঁজাকোলা করে ঘরের দিকে নিয়ে চলল। শূদ্র বালিকার আত্মত্যাগের বাসনা তার সকল কৌলিন্য ধূলায় মিশিয়ে দিল। ঘরে পৌঁছতেই কমল অস্থির হয়ে প্রশ্ন করল, "তুমি কে? আমার শান্তার কি হয়েছে?"

"ওকে সাপে দংশন করেছে।"

"আমার শান্তা!" বলে কমল চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

রনবীর বলল, আমি এক্ষুণি সাপুড়ে ডেকে আনছি।"

"কোথায় পাবে বাবা, সাপুড়ে?"

"আট ক্রোশ দূরে একজন সাপুড়ে আছে। আমি তাকে চিনি। আমি সেখানেই যাচ্ছি। খুব বেশি সময় লাগবে না।"

"ততক্ষণ কি আমার শান্তা বেঁচে থাকবে?"

"আমার ঘোড়া আছে। আমি এক্ষুণি ছুটে যাচ্ছি।"

কমল সাপের দংশিত স্থানটি ফোলা দেখে বলল, "বাবা, তুমি যেই হও, যাবার আগে শান্তার পায়ের ফোলা জায়গাটি কেটে দিয়ে যাও। বিষাক্ত রক্ত বের হয়ে গেলে, মা আমার বেঁচেও যেতে পারে।"

"ধারাল কোন অস্ত্র আছে?"

কমল খুঁজে খুঁজে একটি মরচে ধরা খাপ শুদ্ধ তরবারি এনে দিল। রনবীর খাপটি হাতে নিয়ে অবাক হয়ে দেখল, ওটাতে তার পিতার নাম লেখা রয়েছে। খাপ থেকে তরবারি বের করতেই ওটা চক্‌চক্ করে উঠল। ক্ষিপ্র হাতে রনবীর শান্তার পায়ের ফোলা স্থানটির খানিকটা চামড়া কেটে দিল। ক্ষত স্থান থেকে কালো রক্ত বের হতে লাগল। রনবীর বলল, আপনি শান্তাকে দেখুন মা! আমি সাপুড়েকে আনতে যাচ্ছি।"

উনত্রিশ

রনবীর দ্রুত বেগে ঘোড়া চালিয়ে সাপুড়ের বাড়ী অভিমুখে রওনা হল। পথে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। কিন্তু রনবীর মোটেই পরোয়া করল না। বৃষ্টিতে ভিজে সপ্‌সপ্ হয়ে সে যখন সাপুড়ের গ্রামে পৌঁছল, তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে। একটি বাড়ীর সামনে ঘোড়া থামিয়ে সে লোকজনদের ডাকল। কোমরে তরবারি ঝুলানো সুদর্শন উচ্চ বংশের

যুবককে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার দেখে ভয়ে কেউ ঘর থেকে বের হ'তে চাইল না। পাড়ার সরদার জানতে পেরে গলায় গামছা জড়িয়ে ছুটে এসে রনবীরকে মাথা নুইয়ে প্রণাম করল। হাতজোড় করে বলল, "কি আজ্ঞা মহারাজ! এ দূর্যোগের দিনে আমরা আপনার কি সেবা করতে পারি? বৃষ্টিতে আপনি ভিজে গেছেন। আমাদের গরীবের কুটিরে পদধূলি দিলে আমরা আগুন জ্বেলে আপনার শীত দূর করতে পারি।"

রনবীর বলল, "তোমার নাম কি?"

"আমার নাম যোগেন, মহারাজ! আমি এ পাড়ার সরদার।"

" এই গ্রামে যে একজন সাপুড়ে ছিল, কোথায়?"

"সে ওই পাড়ায় একটি রোগী দেখতে গিয়েছে। বৃষ্টির জন্য সম্ভবতঃ সেখানেই আটক হয়ে পড়েছে।"

"আমি সেখানেই যাব। আমাকে পথ দেখিয়ে দিতে পারবে?"

"একশো বার মহারাজ! কিন্তু এ বৃষ্টির মধ্যে আপনার যাবার দরকার কি? আপনি একটু গরীবের কুটিরে বিশ্রাম করুন। আমি তাকে ডেকে আনছি।"

"না, না, আমিই যাব। খুব তাড়াতাড়ি আমার যাওয়া দরকার।"

সরদার এবং মহল্লার আরও কয়েকজন মিলে নিকটের পাড়ার দিকে রওনা হল। সরদারের আদেশে একজন যুবক রনবীরের ঘোড়ার তত্ত্বাবধানে রয়ে গেল। একটি কুটিরে গিয়ে দেখা গেল, সাপুড়ে ভাং খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে গান গাইছে। সরদার তাকে ডেকে বলল, "কালু, বের হয়ে এস। এক্ষুণি মহারাজের সঙ্গে তোমাকে শহরে যেতেহবে।"

কালু বলল, "আমি কোথাও যাব না। মহারাজই আসুন আর সেনাপতিই আসুন। আমি এ বৃষ্টির দিনে বের হ'বো না।"

সরদারের হুকুমে দু'জন যুবক কালুকে জোর করে ধরে নিয়ে চলল, অপর একজন তার ঔষধের থলেটি উঠিয়ে নিয়ে রওনা হল। ঘোড়ার নিকটে পৌছে সরদার বলল, "মহারাজ! আপনি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ঔষধের থলেটি নিজের কাছে রাখুন। আমি একে ঘোড়ায় তুলে দিচ্ছি।"

সরদারের নির্দেশে কয়েকজন লোক কালুকে পাঁজাকোলা করে ঘোড়ায় বসিয়ে দিয়ে বলল, "শক্ত করে ধর। তা না হলে পড়ে গিয়ে হাত পা ভেঙ্গে মারা পড়বে।

বৃষ্টির ধারা ও ঘোড়ার বেগ কালুর নেশা ছাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সচেতনভাবেই রনবীরের কোমর ধরে বসল। কুটিরে পৌছে নরবীর জিজ্ঞেস করল, "শান্তা কোথায়?"

শান্তা এক পার্শ্বে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিল। কালু শান্তাকে পরীক্ষা করে বলল,

"ভয়ের কোন কারণ নেই। জায়গাটা কেটে দিয়ে খুব ভাল করেছেন। সাপটাও খুব বেশী বিষাক্ত নয় বলে মনে হচ্ছে।"

সে দংশিত স্থানে একটা মালিশ লাগিয়ে দিল। এক জাতীয় চূর্ণক গরম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে চামচ দিয়ে শান্তার মুখে ঢেলে দিল। ঘন্টা খানিক সময় কেটে যাবার পর শান্তা চোখ মেলে তাকাল।

রনবীরকে চিন্তিত মুখে তার মুখের উপর ঝুঁকে থাকতে দেখে শান্তা বলল, "আমি ভালআছি।

রনবীর অশ্রুসজল কণ্ঠে বলল, "তুমি শীগ্‌গীর সুস্থ হয়ে উঠবে, শান্তা!"

শান্তাকে সুস্থ হতে দেখে রনবীরের ক্ষুধা অনুভব হল! পাঁচু রনবীরের পরিশ্রম ও সারাদিন অনাহারে থাকার বিষয় জানত। ঘরে দুধ মাখন সব কিছুই আছে। কিন্তু শূদ্রদের ঘরে উঁচু জাতের যুবককে খাবার অনুরোধ করে সে অপরাধী হয়ে যাবে বলে ভয় ছিল। আবার ভাবল, এ যুবক সুখদেবেরই মত। হয়ত সে এসব ছোঁয়া-ছুয়ির উর্ধে। কিন্তু তবু মাটির বাসনে তাকে কী করে খাবার দেয়া যায়। পুনরায় পাঁচুর স্মরণ হল, সুখদেব মাটির বাসন অপছন্দ করতো না। রনবীরও হয়ত অপছন্দ করবে না। কিন্তু সুখদেব তো কমলের জন্য সব কিছুই করেছিল। রনবীর কার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করবে? তবে কি রনবীরও শান্তার জন্য এত বড় ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হবে? পাঁচু ওদের দিকে দেখল। রনবীর ও শান্তার চারটি চোখ পরস্পরের নিকট নীরব ভাষায় মনের আবেদন পেশ করছে।

রনবীর বলল, "তাহলে আমি বাড়ী যাই। বাবা হয়ত চিন্তা করছেন। সকালে আবার আসব। সাপুড়ের দিকে একটি সোনার আংটি এগিয়ে দিয়ে সে বলল, "আমার কাছে আজ আর কিছু নাই ভাই কালু। আপনি অনেক কৃপা করেছেন। এখন এটি রাখুন। কাল সকালে এসে আমি আপনার পুরস্কার দেব। ততক্ষণে শান্তাও হয়ত অনেক সুস্থ্য হয়ে উঠবে।"

সাপুড়ে লোলুপ নজরে সোনার আংটিটির দিকে তাকতেই কমল বলল, "না, না, তা হ'তে পারে না। আমার কাছে শান্তার বাবার একটি চিহ্ন আছে। তাই আমি দেব।" বলতে বলতে কমল বাক্স থেকে খুঁজে পুরাতন একটি সোনার আংটি এনে রনবীরের হাতে দিল। সাপুড়ে জিজ্ঞেস করল, "শান্তার বাবা বেঁচে নেই?"

কমল ধরা গলায় বলল, "না বাবা সে বেঁচে নেই।"

সাপুড়ে বলল, "আমি বিধবা দুঃখিনীর কোন কিছু গ্রহণ করি না। ওটা আপনার নিকটইরাখুন।

কমল বলল, "ওটা তোমার হাতেই থাক, রনবীর।"

রনবীর আংটিটি নিয়ে আলোর নিকটে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, ও'তে সুখদেবের

নাম খোদাই করা রয়েছে। পূর্বেই সে তরবারিতে তার পিতার নাম দেখতে পেয়েছিল। খুশী হয়ে মাধবকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার পিতাজীর নাম কি সুখদেব?"

মাধব বলল, "হ্যাঁ।"

রনবীর মাধবকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর শান্তার নিকেট গিয়ে বলল, "আমি তোমাকে একটি জিনিস দিচ্ছি। গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না আশা করি।"

আংটিটি তার হাতে পরিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার পিতাজীর এ চিহ্ন তোমার হাতেই থাকা সংগত।"

কমলের দিকে ফিরে রনবীর বলর, "আমার বাবার নাম বললে হয়ত আমাকে চিনবেন। আমিরামদাসের ছেলে।"

কমল রনবীরের মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে বলল, "বাছা! এজন্যই পরের দুঃখ মোচনে তোমার এত উৎসাহ। রামদাসই আমাদের কয়েদখানা থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আর আজ তুমিই আমার শান্তার প্রাণরক্ষা করলে।

রনবীর পাঁচুকে লক্ষ্য করে বলল, "আজ তাহলে যাই।"

পাঁচু বলল, "চলুন! ঘোড়া গাছ তলায় বাঁধা আছে!" কিছুদূর যাবার পর পাঁচু হঠাৎ থেমে গেল। রনবীর বলল, "কি হল?"

"ওই দেখুন না গাছের আড়ালে একটি লোক লুকুচ্ছে মনে হয়।"

রনবীর বলল, "কে ও? একটু দাঁড়াও তো।"

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির ছুটে পালানোর শব্দ শোনা গেল। পাঁচু বলল, "নিশ্চয়ই লোকটি ঘোড়া চুরি করতে এসেছিল।"

রনবীর বলল, "বড়ই দুঃখের বিষয়। বেচারা ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে গেল।"

পাঁচু বলল, "আপনি অবিকল সুখদেবেরই মত।"

ত্রিশ

পাঁচুর নিকট থেকে বিদায় হয়ে রনবীর ঝিলের দিকে এগিয়ে গেল। একটি গাছের সঙ্গে ঘোড়াটিকে বেঁধে সে ঝিলে নেমে ভাল করে গা ধুয়ে নিল। তারপর ধুতির এক কিনারা পরিধানে রেখে অপর অংশের পানি নিংড়ে সে-অংশ পরিধান করল এবং

ভিজা অংশটুকু পুনরায় নিংড়ে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল। শান্তার প্রাণ রক্ষার উপলক্ষ্য হতে পেরে আজ তার আনন্দের সীমা নেই। এ শূদ্র বালিকাকে সাপে কামড়ানোর পর তার চোখের সামনে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। রনবীর অনুভব করল, ভগবানের বিশেষ কৃপায় তার দুনিয়ায় আবার আশার আলো জ্বলে উঠেছে। সে মনে মনে বলল, "ভগবান! এ সরল প্রাণ দূর্বল মানুষদের অত্যাচারী স্বার্থপরদের খপ্পর থেকে উদ্ধার করার জন্য তোমার দুনিয়ায় এক মহাপুরুষের আবির্ভাব দরকার! তুমি সৃষ্টি করেছিলে মানুষ। কিন্তু সমাজ মানুষের একটা বিরাট দলকে শূদ্রে পরিণত করেছে। তারা তোমার মন্দিরে আসতে পারে না। তোমার পূজা করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ। তোমার গুণকীর্তন করলে তারা অপরাধী হয়, সাজা ভোগ করে। তাদের স্পর্শ করলেও নাকি সমাজের লোকদের দেহ অপবিত্র হয়ে যায়। ভগবান! তুমি সৃষ্টি করার সময় সকলকে একই ধরনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছ। তোমার আলো-বাতাস, রৌদ্র-বৃষ্টি ভোগ করার সমান অধিকার সকলেরই জন্য। অথচ তোমার মন্দিরে যাওয়া, তোমার পূজা করা কিছু লোকের জন্য কেন নিষিদ্ধ হবে? এ ধরণের নিকৃষ্ট আইন তোমার আইন হতে পারে না। সমাজের স্বার্থপর লোকদেরই কান্ড এসব। তোমার এ সুন্দর পৃথিবীতে আজ অসংখ্য মানুষ নির্যাতিত, পদদলিত। তাদের উদ্ধার করার জন্য তুমি একজন ত্রাণকর্তা পাঠাও।"

প্রার্থনার পর রনবীর ভোরের আলোতে শহরের দিকে হাঁটতে লাগল। কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই কয়েকজন সিপাহীর সে সাক্ষাৎ পেল। তারা তাকেই খুঁজছিল। সারারাত শহরের আনাচে কানাচে তারা তাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। রনবীর বুঝতে পারল, তার পিতা নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। সে আরও দ্রুত বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল। কিছুদূর যেতে না যেতেই সে তার পিতা, অর্জ্জুন এবং শহরের আরও অনেক বিশিষ্ট লোককে দেখতে পেল। তারা একত্রে এদিকেই আসছে। রামদাস তাকে দেখেই চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এই যে রনবীর! আরে বাবা, আমাদের সারারাত খুব কষ্ট দিয়েছ! কোথায় গিয়েছিলে বলতো?"

রনবীর লজ্জিত হয়ে বলল, "আমি শিকারের উদ্দেশ্যে দূরে গিয়েছিলাম বাবা! পরে বৃষ্টির দরুন এক জায়গায় আটক হয়ে পড়ি।"

"যাও, যাও! তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যাও। সব কথা পরে শুনব।"

দুপুর বেলা ঘুম থেকে জেগে উঠেই রনবীর দেখল, মোহিনী তার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে। মোহিনী মৃদু হেসে বলল, "রনবীর! আমি আরও দু'বার এসেছিলাম। তুমি তখন খুব ঘুমুচ্ছিলে, তাই জাগানো ঠিক মনে করিনি। এবার অতি কষ্টে তোমার ঘুম ভাঙ্গালাম। বাবা তোমার পিতাজীর সঙ্গে তোমাকে সারারাত তালাশ করেছেন। মা'ও সারারাত কেঁদেছেন। তুমি ছিলে কোথায়?'

রনবীর হাই তুলে উঠে বসল। বলল, "তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলব না মোহিনী! আমি

ঝিলের ওপারে গিয়েছিলাম।"

"সারারাত সেখানে কাটালে?"

"মোহিনী! জানো, শান্তাকে সাপে কেটেছিল?"

"বল কি? তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"তারপর এখন সে কেমন আছে?"

"বোধহয় ভাল হয়ে যাবে। আমি আট-দশ ক্রোশ দূরে নদীর ওপার থেকে একজন সাপুড়েকে আনতে গিয়েছিলাম।"

"এত ঝড়-বৃষ্টির ভিতরে তুমি নদীর ওপারে কি করে গেলে?"

"সে অনেক কষ্টের কাহিনী। যাহোক, তুমি কি শান্তাকে দেখতে যাবে?"

''নিয়ে চল।"

"তাহলে তুমি তৈরী হয়ে এসো। আমি ঝিলের এপারে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। এসময় পথে লোকজন থাকে না, তবু যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, বলবে, মন্দিরে যাচ্ছি।"

একত্রিশ

শংকর কিছুকাল যাবৎ অনুভব করছিল যে, নগরপতি, মন্দিরের পুরোহিত ও শহরের সিপাই সকলেই নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে, আর এদিকে রনবীর ধর্ম নষ্ট করার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আর সকলে উদাসীন হয় হোক, শংকর ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব থেকে কিভাবে নিজেকে উদাসীন রাখতে পারে? পরশু রনবীর যখন ঘোড়ায় চড়ে গেল, তখন সে মন্দিরের দিকে যায়নি। শংকরের মনে সন্দেহ জাগল, সে ঝিলের দিকে ছুটে গেল। সেখানে রনবীরের ঘোড়াটিকে মাধবের জীর্ণ কুটিরের পার্শ্বে দেখা গেল। শংকর গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রনবীরের গন্তব্যস্থল সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগল। রনবীর সেই সময় ঘোড়ায় চড়ে আবার দ্রুত অন্য দিকে চলে গেল। শংকর বুঝতে পারল, রনবীর শহরের বাইরে কোথাও যাচ্ছে। বিষয়টি ভালভাবে বুঝার জন্য সে রনবীরের ফিরে আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত করল। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টিতে

বাধ্য হয়ে তাকে মন্দিরের দিকে যেতে হল। বৃষ্টি থেমে গেলে আবার সে আগের জায়গায় ফিরে এলো। এক সময় রনবীর একজন সাপুড়েকে সঙ্গে নিয়ে শূদ্রদের কুটিরে প্রবেশ করল। শংকর কুটিরের খুব কাছে গিয়ে ভিতরের লোকদের কথাবার্তা শুনার চেষ্টা করল। কিন্তু ভাল করে কিছুই সে বুঝতে পারল না। কিন্তু রনবীর যখন বলল, "আমি এখন যাই।" তখন সে কথা শুনে শংকরের হতাশা বেড়ে গেল। সে মনে মনে চিন্তা করছিল যে, এক্ষুণি ছুটে গিয়ে রামদাস ও শহরের সিপাইদের সে ডেকে এনে রনবীরের 'অপকর্মটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে। কিন্তু তা আর হল না। রনবীর বলল, "আমি কাল আবার আসব।" শুনে শংকর মনে আনন্দিত হয়ে উঠল। সে রনবীরের ঘোড়াটির পাশ দিয়ে মন্দিরে ফিরে যাচ্ছিল। ঠিক সে সময় রনবীর ও পাঁচু সেখানে পৌঁছে গেলে শংকর পালিয়ে গেল।

মন্দিরে গিয়ে শংকর দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়েই রইল। আগের রাত্রিতে ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে জাগরণে কাটাতে হয়েছিল। দুপুর বেলা গোপাল তার গায়ে এক বালতি পানি ঢেলে দিয়ে জাগিয়ে তোলে। শংকর রেগে উঠেই সামনে পুরোহিত ঠাকুরকে দেখতে পায়। তিনি বলেছিলেন, পূজা পাট নেই। মন্দিরে এভাবে ঘুমাচ্ছ। রাত্রিতে কি কর?"

পুরোহিত চলে যাবার পর শংকর মুখ হাত ধুয়ে খাবার খেয়ে নিল। তারপর শূদ্র বস্তিতে গিয়ে রনবীরের খোঁজ করতে লাগল। মাধবদের ঘরের পার্শ্বে গিয়ে সে বুঝতে পারল রনবীর আসেনি। নিরাশ হয়ে ফিরে তাকাতেই তার বুকখানা খুশীতে দুলে উঠল। দেখল রনবীর ও মোহিনী এদিকেই আসছে। শংকর তৎক্ষণাৎ একটি গাছের আড়ালে আত্মগোপন করল। মোহিনী ও রনবীর কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিল। শংকরও তাদের পেছনে পেছনে ঝোপের আড়ালে আড়ালে পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে লাগল। মোহিনী ও রনবীর শূদ্রদের কুটিরে প্রবেশ করল। শংকর এমনটি আশা করতে পারেনি। সে আরও নিকটে গিয়ে মোহিনীর গলার স্বর স্পষ্ট শুনতে পেল। মোহিনী দয়ার্দ্র কণ্ঠে বলল, "শান্তা! এখন কেমন আছ, বোন?"

শংকরের কানে যেন গরম গলানো সীসা প্রবেশ করল। সে দ্রুত গতিতে শহরের দিকে ছুটল। পথে তার সঙ্গে পুরোহিতের দেখা হ'লে শংকর তাকে সব কথা বলল। তারপর দুজনেই ঊর্ধশ্বাসে নগরপতির বাড়ীর দিকে ছুটে চলল।

বত্রিশ

বহুদিন পর মোহিনী কমলের ঘরে প্রবেশ করলে, কমল প্রথমে তাঁকে চিনতে পারল না। মাধব একবার মাত্র "মোহিনী" বলে সম্বোধন করেই নীরব হয়ে গেল। কী বলে তাকে অভ্যর্থনা জানানো উচিত, তা তার স্মরণ হল না। মোহিনী তার কুটিরে আসবে, এটা সে কখনই আশা করতে পারেনি। শান্তা হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। ওদিকে মোহিনী এগিয়ে গিয়ে শান্তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে, সে একটি খাটিয়া এগিয়ে দিয়ে বলল, "মোহিনী দেবী! বসুন।"

মোহিনী রনবীরের ইঙ্গিতে সেখানে বসে পড়ল।

কমল রনবীরকে বলল, "তুমিও বস বাবা! এ মেয়েটি কে বাবা?"

রনবীর বলল, "ওর নাম মোহিনী! ওর পিতার নাম অর্জ্জুন! সেবার শংকর যখন মাধবকে মেরেছিল, তখন এই মেয়েটিই আমার সঙ্গে ছিল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে। সে সময় ও তো খুব ছোট ছিল। বড় ভাল মেয়ে। আমার মনে আছে, তার নিজের কাপড় দিয়ে সে মাধবের মাথায় পট্টি বেঁধে দিয়েছিল। কেমন আছ মা তুমি?"

মোহিনী বলল, "আমি ভালই আছি। শান্তার জন্য খুব দুশ্চিন্তা ছিল। শান্তা তো ভাল আছে মনে হচ্ছে।"

সাপুড়ে নিকটেই বসে ছিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলে উঠল, কেন ভাল হবে না? আমার মাথার চুল তো আর রোদে সাদা হয় নি!"

রনবীর বলল, "আপনার অনেক দয়া।"

সাপুড়ে বলল, "এখন আমি যেতে চাই, মহারাজ।"

"এত তাড়াতাড়ি কেন যাবেন? দু' একদিন থাকুন।"

"না, মহারাজ! বিপদের সময় অনেক লোক আমার কাছে ছুটে আসে। আমাকে না পেয়ে তারা ফিরে যাবে। মেয়েটি এখন বিপদ মুক্ত। আমাকে আজ্ঞা দিন।

"তাহলে আমি বিকালে আপনাকে ঘোড়ায় করে পৌঁছে দেব।"

"পাঁচু বলেছে, সে নাকি আমাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে পৌঁছে দেবে।"

"তাই বলেছে? ঠিক আছে তাই হবে!"

বলে মুখ ঘুরাতেই রনবীর দেখতে পেল মাধব মোহিনীর দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে যেন চোখের ভাষায় দেবীর পদযুগলে অর্ঘ্য পেশ করছে। আর এ দিকে শান্তার

নজর রনবীরেরই দিকে। মোহিনী চোরা দৃষ্টিতে মাধবের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছে, মাধব অন্য কোনদিকেই চোখ ফিরায় না। মনের গভীর কোণে মাধবের মধুর ভালবাসার জবাবও উঁকি ঝুঁকি মারছে। সমাজের কঠোর শাসনের কথা স্মরণ করে সে নিজেকে দমন করারও চেষ্টা করছে। রনবীর ও শান্তার পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময়ও তাকে অস্থির করে তুলল। মোহিনী নিজেকে মাধবের আকর্ষণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য রনবীরকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করার আশা পোষণ করতো। কিন্তু তার বুঝতে আর বাকী রইল না যে, ঐ ঢালটিই এখন শান্তার প্রেমে গলে তরল হয়ে পড়েছে। সে চঞ্চল হয়ে বলল, "চল রনবীর, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

পাঁচুও তন্ময় হয়ে মোহিনীকে দেখছিল। মাধব রাতদিন পরিশ্রম করে যে তিনটি মূর্তি তৈরী করেছে, তা যে এ বালিকারই প্রতিকৃতি, তা বুঝতে পাঁচুর কোনই অসুবিধা রইল না। মূর্তিগুলো ঘরের এক কোণে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। মোহিনী ও মাধবের চোখ মুখ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। তার মনেও মোহিনীর জন্য স্নেহের সঞ্চার হল। পাঁচু বলল, "তুমি আজ প্রথমবার গরীবের কুটিরে এসেছ, মা! একটু খানি বস।"

রনবীরও সমর্থন করে বলল, "হ্যাঁ, একটু বস মোহিনী।"

রনবীর পাঁচুকে জিজ্ঞাসা করল, "মাধবের তৈরী মূর্তিগুলো কোথায়? মোহিনীকে দেখাও তো! তুমি দেখবে না, মোহিনী?"

মোহিনী কোন উত্তর দিল না। ওদিকে পাঁচু মূর্তির উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিল। রনবীর বলল, "দেখলে মোহিনী! আয়না নিয়ে নিজের চেহারা দেখ। দেখতে পাবে হুবহু তুমিই যেন পাথরের রূপ ধারণ করেছ।"

সাপুড়েও কাছে গিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এ মূর্তিগুলোতে প্রাণ দিতে পারলে, এগুলো দেখতে হুবহু আপনার মতই হয়ে উঠবে। চুল পরিমাণও এদিক সেদিক হবে না।"

প্রতিটি মূর্তির পায়ের নিকটেই ফুল সাজানো আছে। মোহিনীর চোখে অশ্রু দেখা দিল। সে হঠাৎ ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং নিকটবর্তী একটি গাছের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করতে লাগল।

মাধব আর স্থির থাকতে পারল না। সে রনবীরের পা ছুঁয়ে বলল, "এবার আমাকে সাহায্য কর। মোহিনী অসন্তুষ্ট হয়ে বের হয়ে গেছে। নিশ্চয় সে রাগ করেছে।"

রনবীর বলল, "তুমি মোটেই চিন্তিত হয়ো না, মাধব! সে তোমার ওপর মোটেই রাগ করেনি। আমি তাকে এখুনি ফিরিয়ে আনছি।"

রনবীর একথা বলেই ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে গেল এবং মোহিনীকে দেখতে পেয়ে নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "মোহিনী! কি হল তোমার?"

মোহিনী চোখ মুছে মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার নিষ্ফল চেষ্টা করল। বলল, "কিছুই

হয়নি রনবীর! সত্য করে বল, তুমি আমাকে ঘৃণা কর না তো?"

"ঘৃণা? তা-ও তোমাকে? এ প্রশ্ন কেন করছ, মোহিনী?

"রনবীর, তুমি তো জানো, মাধব যা কিছু করেছে তা আমার অজান্তেই করেছে। আমি তার সঙ্গে কখনো কোন কথা বলিনি। তুমি আমাকে নিশ্চয়ই নির্দোষ মনে কর?"

"মোহিনী! মাধব তোমাকে ভালবাসে। মানুষ দেবতাকে যেমনভাবে ভালবাসে, মাধব তোমাকে তেমনিভাবেই ভালবাসে। বরং দেবতার চাইতেও বেশী ভালবাসে। আমি প্রেমের ক্ষেত্রে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করার পক্ষপাতী নই। প্রেম জাত-ধর্ম মানে না। কাল শান্তা আমার জন্য নিজের জীবন দান করতে প্রস্তুত হয়েছিল। সমাজ আমাকে এদের ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। কিন্তু মানবতা ওদের ভালবাসতে শিক্ষা দেয়। আমি শান্তার মনে আঘাত দেয়া মহাপাপ মনে করি। তোমার জায়গায় যদি আমি হতাম, তাহলে কিছুতেই আমি মাধবকে ঘৃণা করতে পারতাম না। মোহিনী! সত্য করে বলো মাধবকে তুমি ভালবাস না?"

মোহিনী আবার চোখ মুছে বলল, "রনবীর! একথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না। আমি নারী, অবলা। একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর বাইরে যাবার শক্তি আমার নেই।

"মোহিনী! আমি তোমাকে সাহায্য করব। শুধু আমি জানতে চাই, তুমি মাধবকে ভালবাস কি না?"

"ভালবাসা কি বস্তু তা আমি জানি না রনবীর! আমি শুধু এটুকু জানি যে, তাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা বলে আমি আগুন নিয়ে খেলা করতেও রাজী নই। কলংক ও অপমানের চাইতে মৃত্যুকেই আমি শ্রেয় মনে করি। মাতাপিতার সম্ভ্রম নষ্ট করার বদলে আমি আত্মহত্যা করাই ভাল মনে করি।"

রনবীর মোহিনীর কাঁধে হাত রেখে বলল, "তোমার সামনে বাধা-বিপত্তির পাহাড় রয়েছে, একথা আমি জানি। কিন্তু সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে গেলে দুনিয়ায় কোন বাধাই অপরাজেয় নয়! আমি তোমাকে এ বিষয়ে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করব। তুমি সাহস সঞ্চয় কর। মনকে শক্ত কর। সমাজের এ মিথ্যা ভেদনীতির প্রাচীর তুমি ভেঙ্গে দাও। সত্য ও ন্যায়ের জয় অনিবার্য।"

মোহিনী কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ নিকটের ঝোপ থেকে রামদাস বের হয়ে এসে রনবীরের দিকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, "সাবাশ রনবীর! তাহলে তোমার এতদূর অধঃপতনহয়েছে!"

পেছনে পেছনে অর্জ্জুনকে বের হয়ে আসতে দেখে মোহিনী চীৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। রনবীর তাকে উঠাবার জন্য এগিয়ে এলে, অর্জ্জুন তার হাত ধরে পেছনে ঠেলে দিয়ে বলে উঠল, "যাও, সরে যাও। ওকে মরতে দাও।"

রামদাস মোহিনীকে তুলে ধরে বলল, "অর্জ্জুন! মোহিনীর কোন দোষ নেই। সকল

দোষ রনবীরের। সে নিজেও গোল্লায় গিয়েছে, মোহিনীকেও নরকে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।"

মোহিনীর জ্ঞান ফিরলে ঝোপের ভিতর থেকে শংকর ও পুরোহিত বের হয়ে এলো। মোহিনী কিছু বলতে গেল। রামদাস বাধা দিয়ে বলল, "কোন কথা বলো না, মোহিনী! আমরা তোমাদের সকল কথাই শুনেছি। তুমি শংকরের সঙ্গে বাড়ী যাও।" শংকরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মোহিনীকে বাড়ী পৌঁছে দাও। আর খবরদার! কেউ যেন এ বিষয়ে কিছুই শুনতে না পায়।"

ঝোপের ভিতর থেকে আরও দুজন লোক বের হয়ে এসে রামদাসের ইঙ্গিতে রনবীরের দু'হাত বেঁধে ফেলল। রামদাস পুরোহিতকে লক্ষ্য করে বলল, "পুরোহিত ঠাকুর! আমাদের মান-সম্ভ্রম এখন আপনারই হাতে।"

পুরোহিত বলল, "এসব ঘটনা কেউ জানতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

রামদাস রনবীরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাল তুমি শিকারের জন্যে গিয়েছিলে। এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা করনি যে, তোমার পিতা নগরপতি।" অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে বলল, অর্জ্জুন! আমি খুবই লজ্জিত। এখন আমার দ্বারা যা করা সম্ভব সব কিছুই করব। মোহিনীর বয়সই বা কত? সরলা বালিকার কোন দোষ নেই। এসবই রনবীরের কারসাজি। চল, বাড়ী যাই। সবই ঠিক ঠাক করা হবে।"

পাঁচু সাপুড়েকে পৌঁছে দিতে গিয়েছে। মাধব ঘরে বসে মনের চাঞ্চল্য দমন করতে পারছে না। মোহিনী তার কুটির থেকে বের হ'য়ে যাবার পর তার মনে দুর্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে। মোহিনী রাগ করে চলে গেল কিনা, তাও সে বুঝতে পারছে না। উঁচু জাতের লোকদের মূর্তি তৈরী করা পাপ কি-না, তা তাঁর জানা নেই। যদি পাপ হয়ে থাকে তাহলে রনবীর নিশ্চয়ই মাধবকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিত। কারণ যাই হোক না কেন, মোহিনী খুশী হয়ে যায়নি, একথা স্পষ্ট। মোহিনীর সঙ্গে তার দেখা হবে সে আশা সুদূর পরাহত। এখন তার কি করা উচিত? মাধব ভাবল, মোহিনীর মূর্তি গড়তে গিয়ে ভগবানকে সে ভুলে গিয়েছিল। সেজন্যই হয়ত ভগবান মোহিনীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন। মাধব ভগবানের কাছে আরজী পেশ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে ধীরে ধীর ঝিলের কাছে একটি ঝোপের ভিতরে প্রবেশ করল এবং চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভজন গাইতে শুরু করল। ঠিক এমনি সময় ঝোপের ভিতর থেকে হঠাৎ শংকর বের হয়ে এসে ধমকে উঠে বলল, এই কুকুর! তুই তোর অপবিত্র মুখে ভগবানের নাম উচ্চারণ করছিস কোন্ সাহসে?

শংকরের চোখমুখে ক্রোধের ছাপ দেখে মাধব ঘাবড়ে গেল। তার কণ্ঠের গানও থেমে গেল। শংকর বলল, "চল্ তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে লাঠি ও কুঠার হাতে আরও কয়েকজন লোক পাশে

এসে দাঁড়াল। মাধব এটাকেও ভগবানেরই ইচ্ছা মনে করে চুপচাপ তাদের নির্দেশিত পথে হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর যাবার পর পেছন থেকে একজন ডেকে বলল, "ঠাকুরজী! ধীরে ধীরে চলুন। এই ভারী জিনিসগুলো নিয়ে হাঁটতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে।"

মাধব পেছন ফিরে দেখতে পেল কয়েকজন সিপাই তার তৈরী করা সেই মূর্তিগুলো কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসছে। মাধব বলল "ওগুলো আমার তৈরী জিনিস। তোমরা নিয়ে যাচ্ছ কেন?"

শংকর রাগে গর্জ্জন করে উঠল, "পাপিষ্ঠ, নরাধম! ফের মিছে কথা বলছিস? এ মূর্তিগুলো তুই আমাদের মন্দির থেকে চুরি করে আনিস নি?

"আমি কারুর জিনিস চুরি করি না।"

শংকর আবার ধমকে উঠলেন, "মুখ বন্ধ কর দুরাচারী, নইলে দাঁত খুলে ফেলব।"

মাধব আর কিছু বলতে সাহস করল না। নীরবে সে পথ চলতে লাগল।

তেত্রিশ

পথে রনবীর কয়েকবার পিতার নিকটে কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু রামদাসের ক্রোধ দেখে কিছু বলার তার সাহস হল না। বাড়ীর সদর দরজায় শংকর দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, "মোহিনীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছি, মহারাজ! আর কোন আদেশ?"

রামদাস বলল, "ঠিক আছে। এখন তুমি যাও।"

রামদাস রনবীরের দিকে তাকাল। রনবীর বলল, "পিতাজী! তার কোন দোষ নেই। সে শূদ্র নয়। তার উপর কোন অত্যাচারই আমি হ'তে দেব না।"

রামদাস রাগে ফেটে পড়ল। রনবীরের গালে সজোরে চপেটাঘাত করে তার চুল ধরে টেনে সে তাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল এবং ক্রোধান্ধ হয়ে ভীষণ প্রহার করতে লাগল। রনবীর অটল স্থৈর্য সহকারে পিতার হাতে মার খেতে লাগল। তার গৌরবর্ণ গালের উপর আঙ্গুলের পুরু ছাপ পড়ে গেল। তার ঠোঁট ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখে রামদাসের মন নরম হয়ে এলো রামদাস বলল, "তুমি তাকে ব্রাহ্মণ মনে কর নাকি? তার উপর অত্যাচার হ'তে দেবে না! নির্লজ্জ অসৎ পাঁজি কোথাকার!"

রনবীর বলল, "পিতাজী! আমি সত্য কথা বলছি।"

"চুপ করে থাক অসভ্য!" রামদাস গর্জ্জন করে উঠল। সে রনবীরের হাত ধরে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "চল, আমার সঙ্গে।"

রনবীর অগত্যা পিতার সঙ্গে যেতে লাগল। রামদাস তাকে বাড়ীর একটি কুঠরীতে ঠেলে দিয়ে বাইরের দিক থেকে দরজার শিকল টেনে দিয়ে বলল, "তুমি এখন এখানেইথাকবে।"

রনবীর ঠিৎকার করে বলতে লাগল, "পিতাজী! আমার একটি কথা শুনুন। সে কোন মতেই শূদ্র নয়। সে আপনার বন্ধু সুখদেবের সন্তান। আমি সত্য কথাই বলছি। আপনি শুনুন....."

রামদাসের কানে চিৎকার পৌছল না। রামদাস ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গিয়েছে।

সন্ধ্যার কিছু আগে রামদাসের বাড়ীর সামনে লোকজনের বিরাট জটলা দেখা গেল। একটি বিশাল বটগাছ। গাছের গোড়াটি চারিদিকে বৃত্তাকার একটি বেদী দিয়ে ঘেরা। ঐ বেদীর উপরে মাধবের তৈরী করা মূর্তিগুলো সজ্জিত রয়েছে। দর্শকেরা ভক্তি গদগদ হয়ে মূর্তিগুলোর সামনে টাকা পয়সা ও ফুল রেখে যাচ্ছে। শহরের উত্তর দিকে অবস্থিত কালী মন্দিরে আজ আনন্দোৎসব। রামদাসের আমলে মন্দিরের পূজারীগণ মোষ বলিদান করেই সন্তুষ্ট থাকত। আজ বহুদিন পরে নরবলির এক সুযোগ আসার কারণে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ বেজায় খুশী।

রামদাস নরবলির পক্ষপাতী নয়। তার ইচ্ছা, মোহিনী ও মাধবের মেলামেশা জনিত কলংক চাপা দেয়ার জন্য ছেলেটিকে এ এলাকা থেকে বিতাড়িত করে দেওয়া। কিন্তু কে জানতো যে, তার ঘরে মন্দির থেকে চুরি করা তিন তিনটি মূর্তি পাওয়া যাবে! কে জানতো যে, শহরের আট জন গণ্যমান্য ব্যক্তি মাধবকে ভজন গাইবার সময় হাতে নাতে ধরে ফেলবে! এসব জঘন্য পাপের দরুন মাধবকে ভারী শাস্তি থেকে রক্ষা করার কোনই উপায় নেই। রামদাস তো নগরপতি, স্বয়ং মহারাজা হলেও, সমাজের সকল লোককে নারাজ করে কোন কিছু করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই ব্রাহ্মণেরা যখন এক বাক্যে মাধবের জন্য কালী মন্দিরে বলিদানের দন্ড ঘোষণা করল, রামদাস তখন নীরবতা অবলম্বন করা ছাড়া গত্যান্তর দেখল না। সে মনে মনে দুঃখ করে বলল, "বড়ই আফসোস! আমি ছেলেটির জীবন রক্ষা করতে পারছি না। এখন তাড়াতাড়ি বলিদান সম্পন্ন হলেই ভাল। বলিদান শেষ হ'বার আগে রনবীরকে মুক্তি দেয়া সম্ভব নয়। সে মাধবকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে অবশ্যই বিপদে নিক্ষেপ করবে।"

এক জায়গায় একটি অসুবিধা দেখা দিল। কালী মন্দিরের পুরোহিত নদীর ওপারে একটি ধর্মানুষ্ঠানে গেছে। জনগণের চাপে রামদাস পুরোহিতকে নিয়ে আসার জন্য নৌকো পাঠিয়েছে। পুরোহিতের জন্যেই এখন যা কিছু বিলম্ব

চৌত্রিশ

শহরের সিপাইগণ মাধবকে তালাশ করতে এসে কমলের ঘর থেকে তিনটি মূর্তি নিয়ে যায়। স্ত্রীলোকদের প্রতি কোন দুর্ব্যবহার না করার জন্য রামদাস সিপাইদের কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। সিপাইগণ তাই শান্তা ও কমলকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসাবাদও করেনি। শংকরও তাদের সঙ্গে ছিল। সিপাইদের উপস্থিতিতে তার কিছু করার সাহস ছিল না। তাই নিজেকে সামলে নিয়ে সে নীরবেই চলে গিয়েছিল। কিন্তু তার নিজের মনের কুবুদ্ধি তাকে অবশেষে অস্থির করে তুলল।

কমল মাধবকে তালাশ করার জন্য ঝিলের চারধারে খুব ঘুরাফেরা শুরু করল। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। তাই ক্রমেই তার উদ্বেগ বেড়ে চলল। ক্রমে রাত হয়ে এলো। শান্তা ঘরের সামনে খাটিয়ায় বসেছিল। মাধব আর মায়ের জন্য তার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। হঠাৎ সে মানুষের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে "মা, মা!" বলে চিৎকার করে উঠল। কে একজন পুরুষ কণ্ঠে বলে উঠল, "তোর মা ঘরে নেই?"

শান্তা দৃষ্টি ফিরিয়ে মশাল হাতে একজন পূজারীকে দেখতে পেয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কে?"

"চুপ করে থাক! সাবধান! গোলমাল করবি না।" বলতে বলতে লোকটি এগিয়ে গিয়ে খড়ের ঘরে চালের ওপর আগুন লাগিয়ে দিল। শুকনো খড়ে আগুন লেগে চোখের নিমিষে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

শান্তা অসহায়ভাবে ঘর পোড়ার এই দৃশ্য দেখতে লাগল। শংকর হাতের মশাল ফেলে দিয়ে এসে শান্তার হাত ধরে বলল, "তোমার ভয় নেই! তুমি আমার সঙ্গে এসো। তুমি আমার সেবাদাসী হয়ে থাকবে চল।"

শান্তা এক টানে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কয়েক কদম পেছনে সরে গেল।

শংকর বলল, "শূদ্রানীর আবার এত গরিমা কেন!"

শান্তা কিছু না বলে ক্রমে ক্রমে পেছনে সরে যেতে লাগল। শংকর পুনরায় এগিয়ে এসে তার হাতখানি চেপে ধরল। শান্তা এবার শংকরের গালে সজোরে একটি চড় বসিয়ে দিল। শংকর শান্তার হাত ছেড়ে দিয়ে নিজের গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "তোমার ওই ফুলের মত হাত দু'খানা চড় মারার জন্য তৈরী হয়নি। ও হাত তো চুমো

খাবারজন্যে।"

শান্তা ছুটে গিয়ে খাটিয়ার উপর থেকে তরবারি উঠিয়ে নিল এবং তরবারির তীক্ষ্ণ আগাটি শংকরের বুকের দিকে সোজা করে ধরে বলল, "নির্লজ্জ পাপীষ্ঠ! সামনের দিকে আর এক পা বাড়ালে এ তরবারি সোজা তোর বুকে ঢুকিয়ে দেব।"

শংকর ভয়ে পেছনে হটতে শুরু করলে শান্তা সামনের দিকে এগুতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে শংকর হোঁচট খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। পড়েই জ্বলন্ত আগুনের বেড়ার সঙ্গে সে এমনভাবে ধাক্কা খেল যে, তার চোখ মুখ সব ঝলসে গেল। শান্তা বলল, "এই বীরত্ব নিয়ে দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতে এসেছিলি পালিয়ে যা নির্লজ্জ কুকুর!"

শংকর উঠে পেছনদিক ঘুরে ছুটে পালিয়ে বাঁচল। ততক্ষণ জ্বলন্ত ঘরের চারদিকে বহুলোক জমা হয়ে গিয়েছে। শান্তা বলল, "আমি আগে যদি বুঝতে পারতাম, পূজারী ঠাকুর এতটা ভীতু, তাহলে তো আগেই তার কাছ থেকে মশালটা ছিনিয়ে নিতে পারতাম।"

পঁয়ত্রিশ

কিছুক্ষণ পর কমল ঘরে ফিরে এলে শান্তা 'মা, মা' বলে কেঁদে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আমি যা ভুল করেছি, মা! ঘরে তো তরবারি ছিলই। যদি আগে থেকে ওটা ব্যবহার করতাম, তাহলে শয়তানটা বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতে পারত না।

কমল শান্তাকে অভয় দিয়ে বলল, "ওটা কিছু নয় বাছা! আমার কাছে মাধবের চেয়ে বাড়ি ঘরের মূল্য বেশী নয়। মাধবকে সিপাইরা ধরে নিয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।"

যারা ওখানে জড় হয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যে কমল বলল, "তোমরা আমাকে চিনতে পারোনি বোধহয়। আমি তোমাদের অনেককেই জানি। তোমাদের সাধন সরদার আমার পিতা। যারা কুড়ি বছর আগে আমার পিতাকে হত্যা করেছিল, তারাই আজ আমার একমাত্র পুত্র মাধবকে ধরে নিয়ে গেছে। তারা আমার পিতাকে যেভাবে হত্যা করেছে, ঠিক সেভাবেই আমার সন্তানকেও হয়ত মেরে ফেলবে! তোমাদের মধ্য থেকে কে কে আমাকে সাহায্য করতে পার। আমার পুত্রের জীবন রক্ষা কর।"

লোকজন পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি করতে শুরু করল, "সাধন সরদারের কন্যা!

কমল!!"

কমল বলল, "হ্যাঁ, আমিই কমল। তোমরা সুখদেবকে নিশ্চয় ভুলে যাওনি। তিনিই আমার স্বামী।"

কয়েকজন বুড়ো এগিয়ে এলো! একজনের মাথার সব চুল পাকা। জিজ্ঞেস করল, "কমল! তুমি আমাকে চিনতে পারছ মা?"

"কি করে তোমাকে ভুলে যাব, তেজু কাকা! আমি যখন ছোট ছিলাম, তুমিই তো আমাকে কাঁধে করে নিয়ে বেড়াতে। একদিন তুমি আম গাছের নীচে ঘুমিয়ে ছিলে। আমি তোমার ঠোঁট ফাঁক করে তাতে পাকা আমের রস নিংড়ে দিয়েছিলাম। বল তো, তোমাকে চিনতে পেরেছি কী না, তেজু কাকা?"

অশ্রুসজল কণ্ঠে তেজু বলল, "হ্যাঁ, মা! তখন তো আমরা স্বাধীন ছিলাম। এখন সে আনন্দের দিন আর নেই মা।"

কমল বলল, "কাকা, মাধবের খোঁজ কর।"

তেজু বলল, "কমল, তুমি আমাদের সরদারের কন্যা। তোমার আদেশে আমরা যমের সঙ্গেও লড়তে প্রস্তুত। কিন্তু আমরা নিরস্ত্র, অসহায়। আমরা আজ নানা মতে বিভক্ত। সরদারের মৃত্যুর পর আমরা পাহাড়ে লুকিয়ে কিছুকাল লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর রামদাস একদিন নিরস্ত্র অবস্থায় আমাদের নিকটে এসে আমাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে। অনেকে তার কথা বিশ্বাস না করে গভীর জংগলে চলে গেছে। আজ তারা স্বাধীন। রামদাস অবশ্যি আমাদের সঙ্গে কোন দুর্ব্যবহার করেনি। কিন্তু শহরের বাসিন্দারা আজও আমাদের নীচ মনে করে ঘৃণা করে। তাদের শহরে আমরা যেতে পারি না। তাদের মন্দিরে আমরা পূজা করতে পারি না। ভগবান ছোট জাতের লোকদের ডাক শুনেন না। এদিকে ফসলের জমি ও বাস করার বাড়ী পেয়ে আমরা মনের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছি। যারা রামদাসের বশ্যতা স্বীকার না করে গভীর বনে চলে গিয়েছিল, তারা এমন উর্বরা জমি পায়নি। আজও তারা পাতার ছাওয়া জরাজীর্ণ কুটিরে বাস করে। কিন্তু তারা স্বাধীন। তারা শহরের লোকদের তুচ্ছ জ্ঞান করে। আগের দিনের উঁচু জাতের লোকেরা অত্যাচার করে আমাদের দুর্বল করতে পারেনি। রামদাস কৌশলে আমাদের শক্তি হরণ করে নিয়েছে। অবশ্য একথা সত্য যে, দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের পল্লীতে এরা কোন অত্যাচারও করেনি। আজ তাদের হঠাৎ আক্রমণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এরা সাধন সরদারের কন্যা এখানে আসার খবর জানতে পেরেছে। সম্ভবত এজন্যই সরদারের নাতীকে তারা ধরে নিয়ে গেছে।"

কমল বলল, "আর কেউ জানে না। সরদারের পুত্র আমাদের ঘরে এসেছিল। সে মাধবের পিতার আংটি দেখে আমাদের পরিচয় জানতে পেরেছে।"

শান্তা তাড়াতাড়ি করে বলল, "না মা! রনবীর আমাদের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করবে না।"

তেজু বলল, "তুমি এদের জান না। এরা বহু দূর থেকেই তাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর জিনিসগুলো অনুমান করে নিতে পারে। আমিও রনবীরকে কয়েকবার দেখেছি। চেহারা-সুরতে তাকে নরম স্বভাবের লোক বলেই মনে হয়। কিন্তু চেহারা-সুরত দেখে কোন মানুষ সম্পর্কে মতামত পোষণ করা ঠিক নয়। এদের গায়ের চামড়া খুবই মোলায়েম। কিন্তু ঐ চামড়ার নীচে পাথরের তৈরী অন্তর চাপা থাকে।"

শান্তা বলল, "কিন্তু সে তো রামদাসের পুত্র। তুমি তো নিজেই রামদাসের প্রশংসা করছিলে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, রামদাস সত্যই ভাল মানুষ। কিন্তু সে আমাদের সঙ্গে যে ভাল ব্যবহার করে তা-ও উঁচু জাতের স্বার্থেই। আমাদের দাস বানিয়ে রাখার জন্য আগে হাজার হাজার সৈন মোতায়েন করে রাজা-মহারাজাগণ চেষ্টা করেছে, সফল হতে পারেনি। আর আজ রামদাসের মধুর ব্যবহারের দরুন মাত্র দেড়-দুশো সৈন আমাদের বাধ্য অনুগত করে রেখেছে। তারা আমাদের হুকুম দেয়, শহরে এসো না। আমরা তখন শহর থেকে বহু দূরে থাকি। ঐ শহরের প্রতিটি মহলের নীচে আমাদেরই ঘরের ছাই চাপা পড়ে আছে। যদি আমরা আমাদের ছেড়ে আসা কূপগুলো থেকে জল আনতে যাই কিংবা ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ করি, তখনো কি রামদাস আমাদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করবে? রামদাসের অনুমতি ছাড়া তোমাদের ঘর জ্বালিয়ে দেয়া কিংবা মাধবকে গ্রেফতার করা কিছুতেই সম্ভব হয় নি।

শান্তা নীরব হয়ে গেল। তার মন তেজুর যুক্তিতে সায় দিল না।

কমল বলল, "এখন কি করব? তারা মাধবকে নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে।"

তেজু বলল, "মাধবকে উদ্ধার করার জন্য আমি জীবন দিতে রাজী। তবে কয়জন লোক আমার সঙ্গে থাকবে তা আমি বলতে পারছি না।"

পাঁচ জয় জন একসঙ্গে বলে উঠল, "আমরাও তোমার সঙ্গে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

কমল ভাল করে চেয়ে দেখল, ওরা সবাই তেজুরই মত বৃদ্ধ। তার বাপের পুরাতন সঙ্গী। যুবকদের চেহারায় ভীতির চিহ্ন। তারা শহরবাসীদের বিরুদ্ধে কোন কিছু চিন্তা করাও পাপ মনে করে। মায়েরা সন্তানের এবং বোনেরা ভাইদের হাত ধরে টেনে নিয়ে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে চলে গেল। কমলের ঘরের সামনে রইল ছয়জন বৃদ্ধ এবং তেজুর পৌত্র চৌদ্দ পনের বছর বয়সের বালক লালু।

কমল বলল, "সবাই পালাচ্ছে। আমি তো তাদের যুদ্ধ করতে বলিনি।"

লালু এগিয়ে এসে বলল, "আমি মাধবের জন্য লড়বো! শহরবাসীদের আমি মোটেই পরোয়া করি না।"

কমল একটুখানি ছেলের কথা শুনে বিস্মিত হল। বলল, "না বাছা! তুমি ছোট ছেলে। তুমি বাড়ী যাও।" তেজুকে বলল, "কাকা, তুমি শান্তাকে তোমার বাড়ীতে নিয়ে

যাও। আমিই শহরে যাচ্ছি। রামদাস আমাদেরকে রাজার কারাগার থেকে উদ্ধার করে জীবন রক্ষা করেছিল। তা–না হলে পরের দিন ভোর বেলায় আমাদের বলিদান হয়ে যেতো। আজও আমাদের পরিচয় পেলে সে নিশ্চয়ই মাধবের জীবন রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে।"

তেজু বলল, "কমল! রামদাসের বাড়ী শহরের মাঝখানে। তোমার পক্ষে সেখানে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। শহরের ভদ্র লোকেরা তোমাকে কিছুতেই রাজপথে হাঁটতে দেবে না। আর যদি কোন উপায়ে সেখানে যেতেও পার তাহলে রামদাসের সদর দরজায় দাঁড়ানো সিপাই তোমাকে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেবে। মুখের পরিবর্তে ইট ব্যবহার করাও তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়। তাছাড়া শহরের সদর দরজাও এখন বন্ধ। আমি বরং লালুকে পাঠাচ্ছি। সে মাধবের খোঁজ করবে। আর প্রয়োজন হলে সে সাহায্যও করতেপারবে।"

"কে সে লালু?"

"লালু আমার নাতী। এই যে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে।"

"এ কিশোর ছেলে সেখানে গিয়ে কি করতে পারবে, কাকা?"

"তুমি তাকে জান না, কমল! শহরের কোন বাড়ীই তার অচেনা নয়। সে সব জায়গায় যায়। তাকে কেউ কিছু বলে না। রাত্রিতে শহরের প্রাচীর টপকে সে ভিতরে ঢোকে। ওদের ঘরে ঢুকে খাবার দাবার এবং অন্যান্য জিনিস পত্রাদি নিয়ে আসে। তার গায়ের রং ভদ্রলোকদেরই মত। ওদেরই ঘর থেকে চুরি করা কাপড় পরে সে দিনের বেলায় শহরে ঘুরে বেড়ায়। সে ওদের মন্দিরেও যেতে পারে। লালু রাত্রির মধ্যেই মাধবের খোঁজ করতে পারবে। সম্ভব হলে সে তাকে শহর থেকে বের করে আনবে। তুমি এখন আমার বাড়ীতে চল। ভোর বেলা লালু তোমার জন্য অবশ্যই কোন সুখবর নিয়েআসবে।"

তেজুর বাড়ীতে যাওয়া ছাড়া কমল অন্য কোন উপায় খুঁজে পেল না। বলল, "আমার তো সবই গেছে। একমাত্র এ খাটিয়াটি অবশিষ্ট আছে। চল, এটি হাতে করে তোমার বাড়িতেই আশ্রয় নিই, কাকা।"

শান্তা লালুকে এক পার্শ্বে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "লালু! তুমি শহরের সমস্ত বাড়ী চেন?"

লালু বলল, "হ্যাঁ চিনি, কোন বাড়ীই আমার অচেনা নাই।"

"রনবীরের বাড়ী চেন?"

"হ্যাঁ চিনি।"

"রনবীরকে চেন?"

"তাকেও চিনি, বহুবার দেখেছি।"

"লালু! তুমি আমার ভাই। আমার জন্য একটি কাজ করবে মানিক?"

লালু খুশী হয়ে বলল, "নিশ্চয় করব। কি কাজ তুমি বল।"

"তুমি রনবীরের বাড়ীতে গিয়ে তাকে গোপনে বলবে, সাপের বিষে শান্তার অবস্থা আবার খারাপ হয়ে গেছে। মরণের আগে সে একবার তোমাকে দেখতে চায়। আর এ আংটিটি তুমি তার হাতে দিও।"

লালু আংটি হাতে নিয়ে বলল, "আমি বাড়ীতে গিয়ে কাপড় বদল করে এক্ষুণি শহরেযাচ্ছি।"

"তোমাকে আমি রোজ দুধ আর মাখন দেব, ভাইটি আমার!"

"উহুঁ! দুধ-মাখন আমি পছন্দ করি না। আমার পছন্দ বড় লোকদের বাড়ীর পিঠা।" বলেই সে হাসতে হাসতে ছুট দিল।

ছত্রিশ

শূদ্রদের বস্তিতে লালু সকলের নিকটই পরিচিত। সে অত্যন্ত চালাক ও নির্ভীক ছেলে। দৌড়, সাঁতার আর গাছে চড়ার প্রতিযোগিতায় তাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। দুষ্ট বুদ্ধির দরুন সকলের মুখে মুখে তার নাম। জংগলের হিংস্র জন্তু ও শহরের ভদ্র সমাজ কোনটিকেই সে ভয় করে না। একদিন সকলে শুনতে পেল লালু জংগল থেকে ভাল্লুকের ছানা ধরে এনেছে। পরের দিন হয়ত শোনা গেল সে শহরের কোন ভদ্রলোকের পোশাক চুরি করে এনেছে অথবা প্রহরারত তন্দ্রাচ্ছন্ন সিপাহীর বন্দুক কেড়ে এনেছে।

শৈশবেই তার মা বাপ মারা যায়। তেজু অনাথ পৌত্রকে মানুষ করার বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। মারপিট করেও কোন লাভ হয়নি। অবশেষে তাকে সে নিজের ইচ্ছামত চলার স্বাধীনতা দেয়াই কল্যাণকর বিবেচনা করেছে।

প্রথম প্রথম রাত্রিবেলা লালু শহরে ঘুরে বেড়াতো। আজকাল দিনেই সেখানে অবাধে চলাফেরা করে। তার গায়ের রং গৌর বর্ণ। সভ্য সমাজের পোশাক চুরি করে এনে সে জড়ো করে রেখেছে। সেসব কাপড় চোপড় পরে শহরে গেলে কেউ তাকে শূদ্র বলে ধারণাও করতে পারে না। ভদ্র সমাজের কথাবার্তা ও চাল চলন সে নিখুঁতভাবে রপ্ত করে নিয়েছে। মন্দিরে যাতায়াত করে পূজা পার্বনের সকল রীতি নীতিও সে শিখে ফেলেছে।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে লালু শহরে প্রবেশ করল। রামদাসের বাড়ীর সদর দরজায় পাহারাদার দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমাচ্ছে। লালু একটি গাছে চড়ে নিঃশব্দে ছাদের উপর নেমে গেল। সেখানে রামদাস একা নিদ্রিত। পাশে রনবীরের খাটটি শূন্য পড়ে আছে। লালু নীচে নেমে এক জায়গায় কয়েকজন ভৃত্যকে ঘুমুতে দেখল। সেখানেও সে রনবীরকে খুঁজল কিন্তু তাকে নিরাশ হ'তে হল। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। দিনের আলোতেই খোঁজ করতে হবে ভেবে সে কিছু খেয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নিল। একটি পরিচিত গাছের সুমিষ্ট আম তাকে টেনে নিয়ে গেল। এক বাড়ীর ছাদের উপর দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ সে বাড়ীর ভিতর থেকে এক যুবতীর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল। যুবতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, "মা! ঈশ্বরের দোহাই! আমাকে ছেড়ে দাও। সে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ঐ মানুষটি মূর্তি চুরি করেনি। তাদের বাড়ী যাওয়ার অপরাধ আমার। সে জন্য তার শাস্তি হ'তে পারে না। আমরা কোন অপরাধও করিনি। শান্তা রনবীরের জীবন রক্ষা করেছিল, তাই আমরা তাকে দেখতে গিয়েছিলাম।"

মা বলল, "মোহিনী! বাপের মুখে আর কলংকের কালি মাখিয়ে দিসনে। যদি কেউ শুনে ফেলে তখন কি হবে বল্ তো?"

"মা, আমাকে ছেড়ে দাও। যদি তাকে বলি দেয়া হয়, তাহলে আমি নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করব।"

"আমার দুধের মর্যাদা রক্ষা কর, পোড়ার মুখী! মন্দিরে গিয়ে সকলের সামনে তুই এসব কথা বলবি। আর তোর বাবার মাথা হেঁট হয়ে যাবে।"

"তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বল, মা! বাবা তো তোমার কথা শুনেন।"

"না, তোর বাবা ঐ শূদ্রের বাচ্চাকে কালী মন্দিরে বলি দেয়ার শপথ নিয়েছেন।"

"তাহলে আমাকে রনবীরের পিতার কাছে যেতে দাও। যদি তিনি জানতে পারেন যে, মাধবের বোনই রনবীরের জীবন রক্ষা করেছে, তাহলে তিনি অবশ্যই তার জীবন রক্ষাকরবেন।"

"মোহিনী! চুপ কর। রনবীর তার বাবাকে নিজেই সব কথা বলতে পারবে।"

"মা, তুমি নিজেই তো বললে রনবীরকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সে বেচারা তো জানেই না যে, মাধবকে ওরা ধরে এনেছে।"

"আমার সামনে তুই বারবার ঐ কুকুরের বাচ্চার নাম বলবি না। কেউ শুনলে আমাদের মান-সম্ভ্রম সব যাবে।"

"আমি সে জন্য মোটেই পরোয়া করি না। যদি তাকে বলি দেয়া হয়, তাহলে আমি ছাদের উপর থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করব। সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। মা, ভগবানের দোহাই। তাকে বাঁচাও। আমি আর কোনদিন ঝিলের ওপার যাব না।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত যুবতীর কান্নার শব্দ শোনা গেল।

এ কথোপকথন শোনার পর লালু ক্ষুধা ভুলে গেল। সে মন্দিরের দিকে এগুতে শুরু করল। পথে সে শংকরকে রামদাসের বাড়ীর দিকে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করল,

"পূজারী ঠাকুর! তোমার মুখ পুড়ে গেল কী করে?"

শংকর রেগে উঠে বলল, "তাতে তোমার কি দরকার?"

লালু মন্দিরে গিয়ে মাধবকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দেবী মূর্তির সামনে পড়ে থাকতে দেখল। মোহিনীর পিতা অর্জ্জুন এবং আরো পনরজন সৈনিক তাকে পাহারা দিচ্ছে। লালু কালক্ষেপ না করে পুনরায় রামদাসের বাড়ী দিকে দৌড় দিল। ততক্ষণে সবাই জেগে উঠেছে। এদিকে অনেক লোকজন রামদাসের বাড়ীতে আসতে শুরু করেছে। লালুও সরাসরি বাড়ীতে ঢুকে পড়ল এবং একটি বিশাল কামরায় শহরের অনেক গণ্যমান্য লোকদের জটলা করে বসে থাকতে দেখল। তারা বলিদান সম্পর্কেই আলোচনা করছে। লালু রনবীরকে তালাশ করল। একটি কামরার দরজায় জনৈক সৈনিককে দাঁড়ানো দেখেই সে বুঝতে পারল, রনবীরকে সেখানেই বন্দী করে রাখা হয়েছে। লালু সৈনিককে বলল, "নগরপতি তোমাকে ডেকেছেন।" সৈনিক লালুর কথা শুনে নগরপতির সঙ্গে দেখা করতে চলে গেল।

লালু দরজার নিকটে গিয়ে বলল, "শোন, রনবীর।"

"কে তুমি ?"

"পরিচয়ের এখন দরকার নেই। আজ কালী মন্দিরে মাধবকে বলি দেয়া হচ্ছে। শান্তা আমাকে পাঠিয়েছে। সাপের বিষ তার শরীরে পুনরায় ক্রিয়া শুরু করেছে। মৃত্যুর আগে সে তোমাকে একবার দেখতে চায়। শান্তা তোমাকে দেয়ার জন্য একটি আংটি দিয়েছিল। আমি তা কপাটের নীচ দিয়ে ঠেলে দিচ্ছি।"

রনবীর বলল, "শোন! আংটি আমাকে দেয়ার দরকার নেই। আমার বাবাকে আংটিটি পৌঁছে দিয়ে বল, এটা তার বন্ধুর স্মৃতিচিহ্ন। আংটিতে যার নাম লেখা রয়েছে তিনিই মাধবেরপিতা।"

পাহারাদার বিরক্ত হয়ে ফিরে এলো। এদিকে লালুও স্তম্ভের আড়ালে আড়ালে সরে পড়ল। রামদাসের কামরায় ভীষণ ভীড়। একজন লোক বলল, "মহারাজ! পুরোহিত ঠাকুর পৌঁছে গেছেন। সব কিছু প্রস্তুত। শুধু আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করা হচ্ছে।"

রামদাস বলল, "আপনারা যান। আমি এক্ষুণি আসছি।"

লোকজন চলে গেলে রামদাস এক ব্যক্তিকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে বলল, "গোপাল! আমি হয়ত ওখানে নাও যেতে পারি। এ নিষ্ঠুর দৃশ্য আমি দাঁড়িয়ে দেখতে পারব বলে মনে হয় না। আমার জন্য বেশী সময় অপেক্ষা না করে বলিদান সমাপ্ত করে ফেলবে।"

গোপাল দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে বলল, "মহারাজ! আপনি ছেলেটিকে দেখেন নি। দেখতে সে হুবহু সুখদেবের মত।"

"কী বললে, সুখদেবের মত?"

"হ্যাঁ, মহারাজ!" বলেই গোপাল বাড়ী থেকে বের হয়ে গেল। রামদাস কামরায় পায়চারি করতে লাগল।

লালু সুযোগ বুঝে সেই কামরায় প্রবেশ করল। সে আংটিটি রামদাসের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "মহারাজ! এই আংটিটি"—

রামদাস আংটিটি তাকের উপর তুলে রেখে বলল, "এখন যাও, পরে দেখব।"

সে সাহস করে বলল, "মহারাজ! ঐ আংটিটি আপনার বন্ধুর।"

রামদাস বলল, "ঠিক আছে। যার আংটি তাকে আমি পৌঁছে দেব। এখন বিরক্ত করো না, যাও।"

লালু শেষ বারের মত সাহস সঞ্চয় করে আবার বলল, "মহারাজ—"

"চলে যাও বলছি, কে আছ?"

লালু নিরাশ হয়ে বের হয়ে গেল এবং বারান্দায় গিয়ে একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়িয়ে কী করা যায় চিন্তা করতে লাগল।

ঠিক ঐ সময় একটি লোক চীৎকার করতে করতে বাড়ীতে ঢুকল, "মহারাজ! সর্বনাশ হয়েছে। একজন শূদ্র শহরে ঢুকে পড়েছে।"

রামদাস কামরা থেকে বের হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে?"

লোকটি বলল, "মহারাজ! একজন শূদ্র তরবারি হাতে শহরে ঢুকেছে। সিপাই তাকে বাধা দিলে সে সিপাইদের আঘাত করছে। সিপাইরা তাকে আঘাত করেছে। সে আহত হয়ে এদিকেই ছুটে আসছে। বলছে, সে নাকি নগরপতির সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লালু দেখতে পেল, পাঁচু একটি রক্তমাখা তরবারি হাতে এদিকেই আসছে। তার পা কাঁপছে! বুক থেকে রক্তের ধারা বয়ে চলেছে।"

রামদাস একখানি তরবারি হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি কে? ওখানেই দাঁড়াও।"

পাঁচু কথা না বলে হাতের ইশারায় বলল যে, সে লড়তে আসেনি। নগরপতির নিকট শুধু ফরিয়াদ জানাতে এসেছে।

রামদাস বলল, "তুমি কেন এ বেশে এখানে এসেছো?"

পাঁচুর রক্তাক্ত ঠোঁট কিছুটা ফাঁক হল। সে বলল, "তুমিই কি রামদাস?"

"হ্যাঁ,আমিই রামদাস বল, কি বলতে চাও।"

"মাধবকে তুমি চেন? মাধব সুখদেবের পুত্র। আর সে কথা রনবীরও জানে। তুমি মাধবকেবাঁচাও।"

কয়েকবার "বাঁচাও, বাঁচাও" বলার পর তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এলো। পাঁচু মাটিতে পড়ে গেল। সে অজ্ঞান অবস্থায় কেবল "বাঁচাও, বাঁচাও" বলতে লাগল। তার চোখ দুটি রামদাসের মুখের দিকে স্থির নিবদ্ধ রইল।

রামদাস অস্থির হয়ে উঠল! তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে রনবীরের কামরার তালা খুলে তাকে বের করে আনল।

রনবীর রাগত স্বরে বলল, "বাবা! তোমার কলজে ঠান্ডা হয়েছে তো? এর নামই কি ন্যায় বিচার? সমাজের আইন ভঙ্গ করেছে তোমার পুত্র, আর বলিদান হচ্ছে এক

নিরপরাধ ব্যক্তির। শত শত বছর ধরে নির্দোষ মানুষের রক্ত তোমার ধর্মের কপালে কলংক টিকা হয়ে লেপ্টে আছে। তুমি কি তারই পুনরাবৃত্তি করলে?"

রামদাস বলল, "রনবীর! উত্তেজিত হয়ো না। আমার সঙ্গে এসো।"

রনবীর পিতার পেছন পেছন হেঁটে পাঁচুর মৃতদেহের নিকটে পৌছুল। তার মাথা ঘুরে গেল। চোখের কোন থেকে তার ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। পিতার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "বাবা! এ তোমার দ্বিতীয় বিজয়। আমি এই লোকটিকে খুব ভাল করে জানি।"

রনবীর পাঁচুর হাত থেকে তরবারিটি তুলে নিয়ে এসে পিতার হাতে তুলে দিয়ে বলল, "বাবা! এটা মাধবের পিতা ও তোমার বন্ধুর দ্বিতীয় নিদর্শন। আংটি তো আগেই দেখেছো।"

"রামদাস বিস্মিত মুখে বলল,কোন আংটি?"

লালু ছুটে গিয়ে কামরা থেকে আংটিটি তুলে নিয়ে এসে বলল, "মহারাজ! আমি এটি আপনার হাতে দিয়েছিলাম। আপনি এটিকে তাকের ওপর রেখে দিয়েছিলেন।"

রামদাস রনবীরের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। রনবীর বলল, বাবা! আংটিটিতে সুখদেবের এবং তরবারিতে তোমার নাম লেখা রয়েছে, দেখ।"

রামদাস কাঁপতে লাগল। কম্পিত রামদাসের হাত থেকে তরবারি ও আংটিটি মাটিতে পড়ে গেল। সে বলে উঠল, "হায় ভগবান! এটাও কি সম্ভব?" বলেই সে রনবীরকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি ভাল করে জান, মাধব সুখদেবের সন্তান?"

"বাবা! এখন সে কথা শুনে আর কি হবে? কাল রাত্রে আমাকে কথা বলার সুযোগ দাওনি। এখন তো যা হবার ছিল, তা হয়েই গেল।"

রামদাস বলল, "না, না, এখনও কিছু হয়নি। ছেলেটি এখনো জীবিত আছে। আমি তাকে বাঁচাতে পারি। অবশ্যই তাকে বাঁচাতে হবে।"

রামদাস আস্তাবলের দিকে ছুটে গেল। রনবীর তরবারিটি এবং লালু আংটিটি তুলে নিয়ে পেছন পেছন ছুটল। রামদাস ও রনবীর দু'টি ঘোড়ায় চড়ে তীরের গতিতে মন্দিরের দিকে রওনা হল। লালু এক লাফে ঘোড়ার উঠে রনবীরকে জড়িয়ে ধরে ঘোড়ায় পিঠে বসে রইল।"

সাঁইত্রিশ

কালী মন্দিরের পুরোহিত হাত জোড় করে দেবী-মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাধবের হাত পা দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে হাঁটু গেড়ে দেবীর সামনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। জনৈক পূজারী একটি চক্‌চকে খড়্গ উঠিয়ে মাধবের ঘাড়ে কোপ দেয়ার জন্য তৈরী

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাধবের চেহারায় ভয়-ভীতির লেশমাত্র নেই। বরং পরিপূর্ণ স্থৈর্য সহকারে সে দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে। তার চোখে শান্ত দৃষ্টি। প্রতি মুহূর্তেই সে দুনিয়ার এ জঞ্জালময় আবাসস্থল ছেড়ে ভগবানের নিকটে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আকুতি জানাচ্ছে। মোহিনীর কথা মনে উদয় হলে ক্ষণিকের জন্য তার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় কিন্তু পরক্ষণেই সে মনে মনে ভাবে, মোহিনী তার লক্ষ্য নয়। সে ছিল লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপলক্ষ মাত্র। তার মাধ্যমেই মাধব ভগবানকে জানতে পেরেছে। এখন স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সে মিশে যাচ্ছে। মোহিনী সেখানে অপ্রয়োজনীয়। ভগবান যদি তাকে রক্ষা করেন, তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে হত্যা করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তার এভাবে মরণ পছন্দ করে থাকেন, তাহলে দুঃখ করার কোন কারণ নেই।

পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে ভজন সঙ্গীত গাইতে শুরু করল। মন্দিরে উপস্থিত জনতা কালীদেবীর জয় ঘোষণা করে ধ্বনি দিল। পূজারী ঠাকুর কোপ দেয়ার জন্য খড়্গ উপর দিকে তুলে ধরল। মাধব মরণের এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পারবে না। মনে করে চোখ বন্ধ করল। ঠিক সেই সময় লালু মন্দিরে প্রবেশ করে উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলল, "থামো, থামো, স্বয়ং মহারাজ আসছেন।"

পুরোহিতের গলার স্বর মাঝপথে স্তব্ধ হয়ে গেল। পূজারী ঠাকুরের খড়্গও গেল থেমে। সকলে দরজার দিকে তাকাল। ততক্ষণে রামদাস মন্দিরের ভিতরে পৌঁছে গেছে। রনবীর তার পেছনেই আসছিল। রামদাস ভিড় ঠেলে মূর্তির নিকটে পৌঁছে মাধবকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়ে ঘোষণা করল, "আজ আর বলিদান হবে না। তোমরা নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যাও।"

হঠাৎ বজ্রপাত হলেও লোকের এতটা অবাক হতো না। তারা একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। কালী মন্দিরের পুরোহিত বলল, "মহারাজ! বলির সমস্ত অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন তো বলিদান বন্ধ করা যায় না। এটা করার অধিকার আপনার আমার কারো নেই।"

"অত্যাচার বন্ধ করার অধিকার সব সময়ই আমার আছে।" বলতে বলতে রামদাস তরবারির সাহায্যে মাধবের হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিতে শুরু করল।

কালী মন্দিরের পুরোহিত কিছুটা দমে গেল। শহরের প্রধান পুরোহিত এগিয়ে গিয়ে বলল, "মহারাজ! আপনি এসব কি করছেন? এতে যে ধর্মের অবমাননা হচ্ছে!"

রামদাস বাঁধন কাটা অব্যাহত রেখে বলল, "ধর্মের মান ইজ্জত জুলুম করে বাড়ানো যায় না পুরোহিত মশায়, বরং ন্যায় বিচারের মধ্যেই ধর্ম।"

পুরোহিত বলল, "মহারাজ! জুলুম কোথায় হল? সে যে ভজন সঙ্গীত গেয়েছিল, আটজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তার সাক্ষী আছেন। সে মন্দির থেকে মূর্তি চুরি করেছে। ব্রাহ্মনদের পঞ্চায়েত যখন তার দন্ড বিধান করেন, তখন আপনিও তাদের সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। আর এখন এভাবে আপনি দেব-মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করছেন?"

অর্জুন অগ্রসর হয়ে বলল, "দেবীর অপমান সহ্য করা হবে না। বলিদান অবশ্যই হবে।"

জনতা চেঁচিয়ে বলল, "বলিদান হতেই হবে। অবশ্যই হবে।"

রামদাস মাধবের সকল বাঁধন কেটে শেষ করে দিল। এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে লক্ষ্য করে বলল, "অর্জুন! তুমি তো জান যে, এ ছেলেটির কোন দোষ নেই। সে মূর্তি চুরি করে নি। তুমি ভালো করেই জান, এসব কার মূর্তি? আমি তোমার মান সম্ভ্রম রক্ষার খাতিরে তো জুলুম করতে পারি না।"

অর্জুন এবার দৃষ্টি অবনত করল। কিন্তু জনতা আগের মতই চেঁচামেচি করে বলতে লাগল, "বলিদান হতেই হবে।"

শহরের জনৈক প্রবীণ ব্রাহ্মণ রাজার প্রধান পুরোহিতের আত্মীয়। সে এগিয়ে এসে বলল, "মহারাজ! ধর্মীয় ব্যাপারে আপনার হস্তক্ষেপ খুবই অন্যায়। আপনি তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবেন না। যদি জোর করেন তাহলে আমরা সকলে মিলে রাজ দরবারোবো।"

রামদাস বলল, "ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে আমি কারো ভয় করি না। আমি জানতে পেরেছি, মূর্তিগুলো ছেলেটি নিজেই তৈরী করেছে। চুরি করেনি।"

"আপনার নিকট কোন প্রমাণ আছে?"

''প্রমাণ রনবীর, সেই সবকিছু বলবে।''

রনবীর এগিয়ে এসে বলল, "ঝিলের পারে বসে মূর্তি তৈরী করার সময় আমি নিজের চোখে তাকে পাথর কাটতে দেখেছি।"

একজন প্রশ্ন করল, "ভজন গাওয়া?"

রামদাস বলল, "যারা তার বিরুদ্ধে ভজন সঙ্গীতের অভিযোগ তুলেছে তাদের একজনকেও আমি বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না। রনবীর, ওকে নিয়ে যাও।"

ব্রাহ্মণ এত সহজে পরাজয় স্বীকার করে নিতে রাজী হল না। তাই সে জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে শুরু করল। ফলে অর্ধেকেরও বেশী সংখ্যক লোক পুরোহিতের পক্ষ সমর্থন করে চিৎকার করতে লাগল।

শহরের প্রধান পুরোহিত বলল, "মহারাজ! এ ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ সে বিষয়ে এখন আলোচনার কোন অবকাশ নেই। বলিদানের দন্ড ঘোষণা করা হয়েছে। মন্দিরে বলিদানের জন্য যে সব অনুষ্ঠান প্রয়োজন, তা সবই সম্পন্ন হয়েছে। এখন এ বলিদান কিছুতেই বন্ধ হতে পারে না।"

ক্ষত্রিয়দেরও ব্রাহ্মণের সমর্থন করতে দেখে রামদাস বলল, "আচ্ছা, তাই হবে। বলিদানঅবশ্যই হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে কালী দেবী ও মহারাজের জয় ধ্বনিতে মন্দির কেঁপে উঠল।

রামদাস হাতের ইশারায় জনতাকে থামিয়ে দিল। বলল, "কিন্তু বলিদান তার হবে না-আমারহবে।"

লোকজন একসঙ্গে প্রশ্ন করল, "আপনার?"

"হ্যাঁ, আমাকে তোমরা বলি দাও।" বলতে বলতে রামদাস হাঁটু গেড়ে দেবী মূর্তির সামনে বসে ঘাড় নীচু করে দিল। পুনরায় বলল, "যদি বলিদান এতই আবশ্যকীয় হয়ে থাকে, তাহলে আমি গর্দান পেতে দিচ্ছি। পুরোহিত ঠাকুর! আপনি সকল উপাচার সম্পন্ন করেছেন। আপনার পূজারীকে আমার গর্দান কেটে ফেলার আদেশ দিন। দেবীর মান রক্ষার্থে আমি নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু এক নিরপরাধ ব্যক্তির রক্তপাত করে আমি দেবীর চরণে জুলুমের উপহার পেশ করতে অক্ষম।"

ব্রাহ্মণগণ স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। ক্ষত্রিয়গণ মুহূর্তে রামদাসের পক্ষে চলে গেল। অর্জুন নিজেই রামদাসের হাত ধরে তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিল। রামদাস পুরোহিতের দিকে তাকিয়ে বলল, "কি পুরোহিত ঠাকুর! থেমে গেলেন যে?'

মাধবের হাত ধরে নিয়ে রামদাস মন্দির থেকে বের হয়ে এল। কেউ তার পথরোধ করার সাহস পেল না। মন্দিরের বাইরে এসে রামদাস বলল, "মাধব! সুখদেব কোথায়?"

মাধব বলল, "বহুদিন আগে আমার বাবা মারা গেছেন।"

"তোমার মায়ের নাম কমল নয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ" মাধব মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

রামদাস বলল, "এক্ষণি তুমি বাড়ী চলে যাও। তোমার মা এবং বোনকে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি পাহাড়ের দিকে চলে যাবে। খুব সম্ভব উত্তেজিত জনতা তোমাদের বাড়ীতে আক্রমণ করবে। ঐ যে সামনে পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, তার অপর দিকে একটি ঝরণা আছে। সেখানে আমার জন্য তোমরা অপেক্ষা কোরো, আমি যথাসময়ে তোমাদের কাছে পৌঁছে যাব।"

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের দৃষ্টিতে একবার রামদাসের মুখের দিকে তাকিয়েই মাধব বাড়ীর দিকে ছুটতে লাগল। রনবীর বলল, "বাবা! তুমি অনুমতি দিলে, আমিও একবার ওখান থেকে ঘুরে আসতে চাই।"

রামদাস মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, "মাধবের বোনের কি যেন নাম?"

"শান্তা।"

"রামদাস মুহূর্ত খানিক চিন্তা করে বলল, এখন তোমার সেখানে যাওয়া সঙ্গত মনে হচ্ছে না। তুমি বরং আমার সঙ্গে এসো।"

"কিন্তু বাবা, শান্তা যে মরণের মুখে।"

"কি হয়েছে তার?"

রনবীর কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মন্দির থেকে হৈ চৈ করে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে বের হতে দেখে রামদাস তাড়াতাড়ি বলল, "ঠিক আছে, যাও। কিন্তু শান্তার অবস্থা খারাপ হলে, আমাকে খবর দিও।"

রনবীর ছুটে গিয়ে ঘোড়ায় সওয়ার হল। লালু ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি

শহরে যাচ্ছেন?"

"না, আমি অন্য জায়গায় যাচ্ছি।"

লালু ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "জানি, আপনি শান্তাকে দেখতে যাচ্ছেন। কিন্তু সে নিজের ঘরে নেই। আমাকে সঙ্গে নিন। সে কোথায় আছে, আমি জানি।"

"তাহলে আমার পেছনে বসো। কিন্তু তুমি কে? শান্তাকেই বা তুমি কি করে চিনলে? তুমি তার কাছ থেকে কি করে আংটি নিয়ে এসেছিলে?"

লালু প্রশ্নগুলোর জবাব না দিয়ে একলাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল এবং ঘোড়া যখন তীর বেগে দৌড়াতে শুরু করল, তখন বলল, "আপনাকে আমি একটা সুসংবাদ দিতেচাই।"

"এ সময় আমার কাছে কোন সংবাদই সুসংবাদ নয়। কিন্তু তুমি যা বলতে চাচ্ছ, শীঘ্র করে বলে ফ্যালো।"

"শান্তা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।"

রনবীরের অন্তর আনন্দে নেচে উঠল। ঘোড়ার লাগাম টেনে সে মুখ ফিরিয়ে বলল, "সত্যি কথা বলছ?।"

"আমি তখন আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম।"

"তুমি সেখানে কখন গিয়েছিলে?"

"আমি সেখানেই তো থাকি।"

"তুমি শহরের বাসিন্দা নও?"

"না।"

"তুমি ক্ষত্রিয় নও?"

"না।"

"তবে তোমার পরিচয় কি?'

"পরিচয় যদি বলি, আপনি আমাকে নির্ঘাৎ ঘোড়া থেকে নীচে ফেলে দেবেন।

"কেন?'

"কারণ আমি একজন শূদ্র।"

"তোমার বেশভূষা দেখে তো তা মনে হয় না।"

"আপনাদের দয়ায় এসব হয়েছে।"

"তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমার মুখের ভাষাও শহরের লোকদেরইমত।"

"ভাষা না শিখলে আপনাদের শহর ও মন্দিরে ঘুরে বেড়ানো সম্ভবপর হতো না।"

"তোমাকে খুব সাহসী মানুষ মনে হয়।" একথা বলে রনবীর পুনরায় ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ঝিলের নিকটে পৌঁছে রনবীর দেখল, মাধব বাড়ীর দিকে ছুটছে। রনবীর ঘোড়া থামিয়ে মাধবের সাথে করমর্দন করল। মাধব লালুকে বলল,"পাঁচু কাকার মৃত্যুর খবর

www.priyoboi.com

এখন কারুর কাছে খবরদার প্রকাশ করো না।"

"ঠিক আছে।"

আটত্রিশ

বিকালের পড়ন্ত রোদে রামদাস ও রনবীর বাড়ীর সামনে একটি বটগাছের নীচে বসেছিল। রনবীর মাধব ও শান্তার সঙ্গে তার পরিচয়ের কাহিনী পিতার নিকট সবিস্তারে বলে শেষ করল। রামদাস সব শুনে জিজ্ঞেস করল, "সত্যই কি শান্তা খুব ভালো মেয়ে?"

"বাবা–", বলে রনবীর দৃষ্টি নত করল।

রামদাস আবার বলল, "সুখদেব ও কমলের মেয়ে অবশ্যই ভালো মানুষ হবে। কিন্তু সত্যি কি তুমি তাকে ভালবাস রনবীর?"

রনবীর দৃষ্টি নত রেখেই বলল, "বাবা! আমি তাকে ছাড়া বেঁচে থাকার কোনই প্রয়োজন বোধ করি না।"

"ভেবে দেখ। সুখদেবের মত তোমাকেও সারা জীবন কাঁটা বিছানো পথে চলতে হবে। এ সুন্দর শহর, এসব আরামদায়ক বাড়ীঘর, সব ছেড়ে তোমাকে বনজংগলে জীবন কাটাতে হবে।"

"বাবা! আমি সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত।"

"যদি আমি তোমাকে ঐ বালিকার ভালবাসা ভুলে যেতে আদেশ দেই?"

"বাবা, তাহলে আমি বলবো, আপনি নিজ হাতে আমার গলা টিপে মেরে ফেলছেন।"

"এতক্ষণে ওরা অনেক দূর চলে গিয়েছে বলে আমার মনে হয়।"

"হ্যাঁ, বাবা!"

"শান্তা এখন সুস্থ হয়েছে কি?"

"ঐ ছেলেটি মিথ্যা কথা বলেছিল। শান্তা ভালই আছে।"

"ছেলেটি কে?"

রনবীর লালু সম্পর্কে যা যা জানতো, সবই তার পিতার নিকট বলল। রামদাস জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, মোহিনী কি সত্যই মাধবকে ভালবাসে?"

"আমার তো তা–ই বিশ্বাস, বাবা!"

"মোহিনী কি জানে যে, মাধব সুখদেবের পুত্র?"

"সম্ভবতঃ জানে না।"

রামদাস পুনরায় চিন্তায় ডুবে গেল। ঠিক ঐ সময় মোহিনী ত্রস্তপদে বাড়ীতে প্রবেশ করল এবং রামদাসের নিকটে এসে বলল, "কাকা বাবু! আপনি মাধবকে রক্ষা করুন। বাবা অনেক লোকজন নিয়ে ওদের বাড়ীতে আক্রমণ করার জন্য রওনা হচ্ছেন। শহরের ব্রাহ্মণরা সবাই আমাদের বাড়ীতে জড়ো হয়েছে।"

রামদাস ইচ্ছা করেই কিছুটা বেপরোয়া ভাব দেখাল। বলল, "আমি তার কি করতে পারি?"

"কাকা বাবু! আপনি নগরপতি! বাবাকে আপনি নিষেধ করতে পারেন। ব্রাহ্মণেরা যদি তার বাড়ীতে চড়াও হয়ে তাকে পিটিয়ে হত্যা করে, তাহলে তাকে আপনি কি জন্য উদ্ধার করলেন?"

"মোহিনী! সে জন্য তোমার এত চিন্তার কারণ নেই। তার ভাগ্যে যা লেখা আছে তা কে খন্ডন করতে পারে?"

মোহিনী নিরাশ হয়ে রনবীরকে বলল, "রনবীর! ওরা তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তুমি তাকে রক্ষা কর।"

রনবীরকে নিশ্চিন্ত দেখে মোহিনী বলল, "ও, তাহলে তোমার সব কিছুই ছিল অভিনয়। তোমাদের অন্তরও তাদেরই মত কুটিল। তুমি কাপুরুষ!" বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। রামদাস তার কাছে উঠে এসে কাঁধের উপর হাত রেখে বলল, "বাছা! একজন শূদ্র তরুণের জন্য তুমি এত চিন্তা করছ, কেন?"

মোহিনী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল এবং বলল, "কাকা বাবু! আমি জানতাম না যে, আপনিও বাবারই মত শূদ্রদেরকে মানুষ মনে করেন না।"

"মোহিনী! আমিও জানতাম না যে, তুমি তাকে এতই ভালবাস। আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।"

"সে নিরপরাধ, এজন্য আমি শুধু তার জীবন রক্ষার জন্য অস্থির।"

"এখন তার জীবন নাশের কোন আশংকা নেই। সে অনেক দূর চলে গেছে।"

"অনেক দূর, কোথায়?"

"পাহাড়ে।"

মোহিনীর মুখ মন্ডলে একই সঙ্গে আনন্দ ও বিষাদের ছায়াপাত হল। অন্তর একবার খুশীতে নেচে উঠে পুনরায় স্তব্ধ হয়ে গেল। চোখের দীপ্তি একবার জ্বলে উঠে আবার নিভে গেল। সে অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে বলল, "তাহলে আপনি তাকে নির্বাসন দিয়েছেন কাকা বাবু?"

"হ্যাঁ, বাছা! তার জীবন রক্ষার খাতিরেই তাকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেয়ার দরকার ছিল!"

"কোথায় পাঠিয়েছেন, কাকা বাবু?"

"যেখানে শহরের কেউ পৌঁছতে পারবে না।"

মোহিনীর দুই চোখে অশ্রুর ঢল নেমে এলো।

রামদাস বলল, "সে তো এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ, তারপরও তুমি কাঁদছ?"

মোহিনী রামদাসের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রনবীরকে জিজ্ঞেস করল, "তার মা এবং শান্তাও কি তার সঙ্গেই গেছে?"

রামদাস বলল, "হ্যাঁ, তারাও তার সঙ্গেই রয়েছে। রনবীরও তাদের নিকট চলে যাবে। সে শান্তার জন্য আমাদের ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

মোহিনী হঠাৎ রামদাসের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, "কাকা বাবু! আমিও রনবীরের সঙ্গে যাব। আমিও মাধবের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। মাধবকে না পেলে আমার জীবনের কোনই মূল্য নেই।"

রামদাস তাকে হাত ধরে তুলল। বলল, "কিন্তু তোমার মাতা-পিতা রয়েছেন। তুমি কি তাদের ত্যাগ করতে পারবে?

"আমি তো আগেই বলেছি। দুনিয়ার সব কিছুই আমি তার জন্য ত্যাগ করতে পারব।"

"সমাজ কি বলবে?"

"আমি সমাজের কোন পরোয়া করি না, কাকা বাবু! তাকে না পেলে আমি জলে ডুবে মরব, না হয় পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ে আত্মহত্যা করব।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে তুমিই জয়ী হয়েছ। এবার তাহলে তৈরী হয়ে নাও। তোমাদের অনেক দূর যেতে হবে। বাইরে খুব অন্ধকার। যে পাহাড়টির চূড়ায় একটি বড় বটগাছ রয়েছে, সেখানে পৌঁছে আমার জন্য তোমরা অপেক্ষা করো। তোমাদের জন্য ঘোড়া তৈরীআছে।"

মোহিনী কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে রামদাসের দিকে তাকাল। তার চোখে তখন অশ্রুর বন্যা।

উনচল্লিশ

শুতে শুতে রামদাসের অনেক রাত হয়ে গেল। এতক্ষণ ছাদের উপর সে পায়চারি করছিল। তার চোখে কিছুতেই ঘুম আসছে না। তার সমগ্র অন্তর আজ শূন্য। বিশাল বাড়ীটি খাঁ খাঁ করছে। দশ বছর আগে রনবীরের মা ইহলোক ত্যাগ করার পর থেকে রামদাস রনবীরকে অবলম্বন করেই বেঁচে ছিল। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত রনবীরের ক্রমপরিবর্তনশীল দৈহিক গঠনের প্রতিটি ছবি তার চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছিল। শিশু রনবীর যেদিন তার কোলে বসে গোঁফ ধরে টানতো, হাতের আঙ্গুল মুখে পুরে

দাঁত দিয়ে কামড়ে দিত, সেদিন রামদাস কোন ব্যথা অনুভব করতো না। বরং তার কাছে ওর দুষ্টুমিটাই ভালো লাগতো। সে পরম যত্ন সহকারে ঐ দুরন্ত শিশুকে ঘোড়-সওয়ারী, তীরন্দাজী ও অসি চালনা শিক্ষা দিয়েছিল। কিশোর রনবীরের প্রতিটি কথা রামদাসের নিকট অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ ছিল। তার চেহারায় ছিল রাজাধিরাজের বিক্রম আর দেবতাদের পবিত্রতা। দিনমানের কয়েকবার রামদাসের মুখ থেকে "আমার বাবা, আমার রনবীর" শব্দগুলি উচ্চারিত হত।

রনবীরের মা মোহিনীর মায়ের বান্ধবী ছিল। অর্জ্জুন রামদাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাই অর্জ্জুন ও সাবিত্রী রনবীরকে প্রাণ ভরে স্নেহ করতো। তারা রনবীর ও মোহিনীকে নিয়ে ভবিষ্যতের এক উজ্জ্বল স্বপ্ন সৌধ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সব কিছুই ওলট পালট করে দিল। রামদাস রনবীর ও শান্তার প্রেমের খবর শুনে খুব রেগে গিয়েছিল। ধারণা করেছিল হুমকি-ধমকি ও কঠোরতার মাধ্যমে এ অবাঞ্ছিত প্রেমের ছেদ টানা যাবে। কিন্তু মাধব ও শান্তার প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাত হবার পর রামদাস আবার সমাজের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আজ তাই সে রনবীর ও মোহিনীকে বিদায় করে দিল।

ভৃত্য অভ্যাস মাফিক আজও রামদাসের পাশেই রনবীরের বিছানা পেতে দিয়েছে। রামদাস রনবীরের শূন্য বিছানা থেকে বালিশটি উঠিয়ে নিয়ে নিজের বুকে চেপে ধরল। যে চোখে বহু বছর যাবৎ অশ্রু দেখা যায়নি, আজ তা সজল হয়ে উঠল। সে ব্যথিত স্বরে বলল, "রনবীর! বাছা আমার! আজ বনের মধ্যে তুমি কিভাবে রাত কাটাচ্ছ জানি না, হয়ত বা পাথরের উপরেই তোমাকে শুতে হয়েছে --। আর আমি --।"

রামদাস উঠে বসল। ছাদের ওপর পুনরায় সে পায়চারি শুরু করল। মাঝ রাত্রে একবার ভৃত্যকে ডেকে বলল, "আমার ঘোড়া তৈরী কর।"

ভৃত্য এসে বলল, "মহারাজ! আপনার ঘোড়া তৈরী করা হয়েছে। অর্জ্জুন মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।"

রামদাস বলল, "তাকে ওপরে নিয়ে এসো।" বলেই খাটের ওপর সে বসে পড়ল।

অর্জ্জুন ওপরে এসেই বলল, "মহারাজ! মোহিনী আজ সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হয়েছিল। এখন তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রনবীর কোথায়?"

রামদাস উত্তর দিল, "রনবীর তো এখানে নেই। তুমি বস অর্জ্জুন।"

"আমি বসতে পারছি না। আমার মনে খুবই অশান্তি। রনবীর কোন্ সময় বাইরে গিয়েছে?"

"অর্জ্জুন, তুমি বস। আমি তোমাকে কতকগুলো কথা বলতে চাই।"

অর্জ্জুন প্রশ্ন করল, "আপনি কি মোহিনী সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"হ্যাঁ, বলছিতো, বস।"

অর্জ্জুন বসে পড়ল। রামদাস অর্জ্জুনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "সুখদেবের কথা তোমার মনে পড়ে অর্জুন?"

"আমি সুখদেবকে কি ভুলতে পারি? কিন্তু মোহিনীর ব্যাপারে সে প্রসঙ্গ কেন?"

"অর্জ্জুন! রনবীর আর মোহিনী আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেছে।"

অর্জ্জুন সহসা দাঁড়িয়ে গেল। সে রামদাসের শেষের কথাগুলো তোতা পাখীর মত আবৃত্তি করল, "আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেছে!"

"হ্যাঁ, চলে গেছে। রনবীর সুখদেবের কন্যার জন্য আর মোহিনী গিয়েছে সুখদেবের পুত্রের জন্য।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। ভগবানের দোহাই! আমাকে সব কথা আপনি বুঝিয়ে বলুন।"

"আমি সত্য কথাই বলছি, অর্জ্জুন!"

"তা কি করে হয়? সুখদেব তো এক অচ্ছুৎ শূদ্র বালিকাকে--"

অর্জ্জুনকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রামদাস বলল, "হ্যাঁ, সে শূদ্র বালিকাকে বিয়ে করেছিল। সেই বালিকার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়। সুখদেব আজ ইহজগতে নেই। তার স্ত্রী-পুত্র তাদের পরিচয় গোপন করে ঝিলের ওপারেই বাস করছিল এতদিন। রনবীর ও মোহিনী তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়। পরে রনবীর সুখদেবের কন্যাকে এবং মোহিনী তার পুত্রকে ভালবেসে আমাদের ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়।"

অর্জ্জুন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে বলতে শুরু করল, "মিথ্যা কথা! শহরের সকলেই জানে যে, সে একজন শূদ্র। যদি মোহিনী তার সঙ্গে গিয়ে থাকে, তাহলে আমি দু'জনকেই প্রাণদন্ড দিব। আপনি নিজের পুত্রকে ধর্ম ত্যাগের পরও ক্ষমা করতে পারেন। আমি তা পারি না। আপনি বন্ধুত্বের মর্যাদা এভাবেই রক্ষা করলেন? শূদ্র হয়ে যে ব্যক্তি আমার মান সম্ভ্রম ডুবিয়ে দিয়েছে, তাকে বলিদান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে আমার কন্যাটিকেও তার সঙ্গে পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন? বলুন, তারা কোথায় আছে? আমি সমগ্র শূদ্র-পল্লী তালাশ করবো। তাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দেব। আপনি নগরপতি। আপনার নিকট সিপাই আছে। তা বলে, জনতার ক্রোধের মুখে সিপাই নিয়েও টিক্‌তে পারবেন না, বলুন! তাদের আপনি কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন?"

অন্য সময় হলে রামদাস এসব কথা সহ্য করতে পারতো না। কিন্তু এ মুহূর্তে অত্যন্ত নরম সুরে বলল, "অর্জ্জুন! তুমি তো জানো আমি ওসব হুমকিতে ভয় পাই না। অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজন বোধে আমি আমার শেষ রক্ত বিন্দু ঢেলে দিতেও প্রস্তুত আছি। তুমি বিশ্বাস কর। সে সুখদেবেরই ছেলে। আমি স্বচক্ষে তার প্রমাণ দেখতে পেয়েছি। সমাজ তাদের দূরে সরিয়ে দেয়ায় তারা শূদ্রদের সঙ্গেই বাস করছিল। কিন্তু ভগবানের খেলা! তিনি রনবীর ও মোহিনীকে তাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন।"

অর্জ্জুনের রাগ কিছুটা প্রশমিত হয়ে এলো। সে বলল, "আপনি কি করে বিশ্বাস করলেন যে, তারা সুখদেবের সন্তান?"

"সুখদেব ও কমলকে মহারাজার কারাগার থেকে উদ্ধার করার সময় আমি তাদের

যে তরবারি দিয়েছিলাম, সেটিই আমি মাধবের নিকট দেখতে পেয়েছি। সুখদেবের নামাংকিত একটি আংটিও দেখেছি। আর মাধবের চেহারা–সুরুত তুমি নিজেও দেখেছ, সে কি অবিকল সুখদেবের মত নয়?"

"তবু আমি মোহিনীকে ক্ষমা করতে পারি না। সে আমার মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছে। আমি কি করে সমাজে মুখ দেখাবো। সুখদেব একজন শূদ্র মেয়ে লোককে বিয়ে করেছিল। সে মেয়ে লোকের গর্ভের সন্তান, চন্ডাল।"

"অর্জ্জুন! প্রেম উঁচু–নীচু বিচার করে না। সে সমাজের কোনই পরোয়া করে না। মানবতার দৃষ্টিতে চিন্তা করে দেখ। বল তো, মাধবের মত সুপুরুষ আমাদের শহরে কতজন আছে? তুমিই তো বলেছিলে যে, সুখদেব কমলকে বিয়ে করে কোন অন্যায় করেনি। তারা উভয়ে একে অপরের জন্যই জন্ম নিয়েছে। আমি বলছি, সুখদেবের পুত্র ও তোমার কন্যা ভগবানের ইচ্ছায়ই একে অপরকে ভালবেসেছে। তারা একজন অপর জনের জন্যই পৃথিবীতে এসেছে। মাধব মোহিনীর জন্য কালীমন্দিরে নিজের মাথা কাটাতেও তৈরী হয়ে গিয়েছিল। মোহিনী মাধবের জন্য নদীতে ডুবে অথবা পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন দিতে প্রস্তুত। আমি নিজেই তোমার অবস্থা অনুধাবন করেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম, মোহিনী ঐ ছেলের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে দৃঢ় সংকল্প, তখন তার পথরোধ করা আমি সঙ্গত মনে করিনি। রনবীরের জন্য আমার মনে যে ব্যথা, মোহিনীর জন্য আমার মনোবেদনা তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়।"

"কিন্তু সমাজ কি বলবে?'

"বন্ধু! আজ পর্যন্ত সমাজের মুখ কেউ বন্ধ করতে পারেনি। কিন্তু সমাজ সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে কি? তুমি সমাজের ভয়ে নিজের সন্তানদের তো বলি দিতে পারোনা!"

"আর ধর্ম?"

"আমরা ধর্মের নামে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করছি। মানবতার চেহারা বিকৃত করছি। মানুষে মানুষে হিংসা ও রেষারেষি সৃষ্টি করছি। ভগবানের সৃষ্ট মানুষের মধ্যে উঁচু ও নীচু জাতের প্রাচীর খাড়া করে রেখেছি। এমন ধর্ম ভগবানের পছন্দনীয় হতে পারে না। এ ধর্ম মানবতার কল্যাণ সাধন করতে পারে না।"

"রনবীর বেটা ছেলে। তার চলে যাবার দরুন আপনার তেমন অপমান না–ও হ'তে পারে। কিন্তু আমি হতভাগার কি উপায় হবে? কাল সকালে শহরের শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই যখন জানতে চাইবে, মোহিনী কোথায়? আমি তাদের কি উত্তর দেব?"

"যদি মোহিনী নদীতে ডুবে মরতো কিংবা পাহাড় থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করতো, তাহলে তুমি কি উত্তর দিতে?'

"আপনি আমার সম্ভ্রম রক্ষা করুন। ওরা কোথায় আছে, বলুন। আমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে মোহিনীকে এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত করব। তাকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেব।"

"আমি এতটুকু জানি যে, মোহিনী চিরদিনের জন্যে সুখদেবের পুত্রের সঙ্গে চলে

গেছে। দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। হতে পারে, তোমার কথায় সে ঘরে ফিরে আসবে। কিন্তু সেটা প্রাণ চাঞ্চল্য ভরপুর মোহিনী নয়। ফিরে আসবে মোহিনীর নিষ্প্রাণ দেহ। তুমি সমাজের আইন রক্ষার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। কিন্তু নিজেকে যাচাই করে দেখো তো, অন্তরে তোমার সমাজের সম্ভ্রম রক্ষার চিন্তাটাই প্রকট, না পিতৃপ্রাণ সন্তানের জন্য ছট্‌ফট্ করছে? আমি মনে করি, ওটা পিতৃহৃদয়ের আকুলি-বিকুলি। তাই যদি হয়, তাহলে মোহিনীকে ফিরিয়ে ঘরে নিয়ে এসে তাকে তিলে তিলে মৃত্যু যন্ত্রণায় ভুগতে দেয়াই কি পিতার কাজ? পারবে কি তুমি সেই জ্বালা সইতে? অর্জ্জুন! তুমিও তো যৌবনে এক শূদ্র বালিকাকে ভালবাসতে। তার জন্য তুমি সব কিছু ত্যাগ করতে রাজী ছিলে। কিন্তু সে বালিকা তার পিতার সঙ্গে পাহাড়ে চলে গিয়েছিল। যদি সে তোমার প্রস্তাবে রাজী হতো, তাহলে তুমি কি সমাজের বন্ধন কেটে বের হবার জন্য প্রস্তুত হতে না? আমি সেদিন তোমাকে কত বুঝিয়েছি। তুমি আমাকে তখন তোমার শত্রু বিবেচনা করতে। আজ তুমি কি সেই অর্জ্জুনই আমার সামনে বসে কথা বলছ?"

অর্জ্জুন নিরুত্তর হয়ে পালংকের উপর উদাস দৃষ্টিতে বসে রইল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল কুড়ি বছর আগের এক দৃশ্যপট। চাঁদনী রাতে শূদ্র বালিকাকে নদীতে স্নান করতে দেখে তার মনে হয়েছিল, বুঝি পূর্ণিমার চাঁদ নেমে এসেছে নদীতে। সে তার হাত ধরে বলেছিল, "শান্তি! তোমার জন্য আমি সব কিছু ছেড়ে দিতে রাজী আছি। তুমি আমার হও।" আজ তার কানে এক সাদাসিদা বালিকার জবাব প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, "না, না, হতে পারে না। তুমি মহারাজার সৈনিক। তোমরা আমাদের গোত্রের হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের রক্তপান করেছ। তোমরা আমাদের শত্রু। তোমাদের প্রেম-ভালবাসায় বিশ্বাস করা যায় না।"

রামদাস জিজ্ঞেস করল, "বল অর্জ্জুন! আমি অন্যায় কিছু বলিনি তো?"

অর্জ্জুন চমকে উঠল। বলল, "আমাকে আর লজ্জিত করবেন না। সেটা ছিল যৌবনের উন্মাদনা। তখন আমি নির্বোধ ছিলাম।"

"না, না, শুধু তুমি নও। ঐ বয়সে সকল মানুষই নির্বোধ হয়। তুমি বা সুখদেবের স্থলে আমি যদি হতাম, তবে তা-ই করতাম। রনবীরের মা যদি ক্ষত্রিয় ঘরে জন্ম না নিয়ে ছোট জাতের মধ্যে জন্মাতো, তাহলে তার জন্য আমি বিনা দ্বিধায় সমাজের সকল বন্ধন কেটে দিয়ে বের হয়ে যেতাম। তুমি যেটাকে যৌবনের উন্মাদনা বলছ, আমি সেটাকেই যৌবনের ধর্ম বলতে চাচ্ছি। প্রকৃতি যখন দুজনের মিলন চায়, তখন সমাজের কৃত্রিম প্রাচীর দিয়ে তাদের পৃথক করে রাখার প্রচেষ্টা মোটেই কল্যাণকর নয়। সমাজ পরিত্যাগ করার দরুন মোহিনী ও রনবীর সাময়িকভাবে হয়ত কিছুটা কষ্ট ভোগ করবে। কিন্তু সমাজের ভয়ে যদি তারা প্রকৃতির দাবী অস্বীকার করতো, তাহলে সমগ্র জীবন তাদের জ্বলে পুড়ে মরতে হত, তাই নয় কি"

অর্জ্জুন মাথা উঠিয়ে বলল, "আমাকে মাফ করুন। আমি অনেক কড়া কড়া কথা

বলে ফেলেছি। আমি বুঝতে পারছি না, চিরতরে মোহিনীকে হারিয়ে তার মা বেঁচে থাকবে কি করে?"

"সন্তানের জন্য মার স্নেহ-মমতার কূল কিনারা নেই। মোহিনীর মায়ের জন্য এর চাইতে খুশীর বিষয় কি হতে পারে যে, মোহিনী বেঁচে আছে এবং আনন্দেই আছে।"

"কিন্তু তার মা যদি তাকে দেখতে চায়, তাহলে পাহাড়ে কি করে খুঁজে বের করবে?"

"সে দায়িত্ব আমার।"

"কবে নাগাদ তা সম্ভব হবে?"

"তুমি এখন বাড়ী গিয়ে বোন সাবিত্রীকে সান্ত্বনা দাও। শীঘ্রই আমি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাবো। আপাতত লোকের প্রশ্নের জবাবে বলবে, 'মোহিনী তার মামার বাড়ীগিয়েছে।'

অর্জ্জুন নীচে নেমে যাচ্ছিল। রামদাস বলল, "শোন, আমি ভোরে এক জায়গায় যাব। দুপুর নাগাদ হয়ত ফিরে আসতে পারব না। শহরে বেশ কিছুটা উত্তেজনা রয়েছে। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব তোমার।"

"আপনি কোথায় যাবেন?"

"আমার বাতের ব্যথার ঔষধ তৈরী করতে হবে। কিছুদিন থেকে ব্যথাটা বেড়েছে। আর সে ঔষধের জন্য কিছু বন্য লতাগুল্মাদি দরকার। আমি সেগুলো সংগ্রহ করতে যাব।"

যদিও একথায় অর্জ্জুনের মনে কিছুটা সন্দেহ রয়ে গেল, তথাপি সাবিত্রীর অস্থিরতা চিন্তা করে সে বাড়ীর দিকেই রওনা হল। অর্জ্জুনের যাবার পর রামদাস অনুভব করল, একটা বিরাট বোঝা যেন তার সহসাই হালকা হয়ে গেল।

অল্পক্ষণ পরই ঢাল-তরবারি ও তীর ধনুকে সজ্জিত হয়ে রামদাস ঘোড়ার পিঠে চড়েবসল।

চল্লিশ

প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রনবীর ও মোহিনী দুর্গম পাহাড়ী পথে এদিক সেদিক ঘুরল। অবশেষে এক জায়গায় আগুন জ্বলতে দেখে রনবীর বলল, "আমরা পৌঁছে গেছি। লালু আমাকে বলেছিল, সে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে। ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান।

মোহিনী জিজ্ঞেস করল, "কে এই লালু?"

রনবীর বলল, "সে এক অদ্ভুত ছেলে। সিংহের মত সাহসী। তার চোখ দু'টি বাজপাখীর চোখের মত তীক্ষ্ণ আর শরীরটি চিতাবাঘের মত গতিশীল। তুমি সারা জীবনেও তার ঋণ শোধ করতে পারবে না। যদি লালু আর মুহূর্ত কাল আগে ছুটে গিয়ে পূজারী ঠাকুরকে বাধা না দিতো, তাহলে পরের মুহূর্তেই ঘাতকের খড়্গ মাধবের মুন্ডটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেল্‌তো।"

"আমি তার পরিচয় জান্‌তে চাই।"

রনবীর মোহিনীকে লালুর পরিচয় জানিয়ে দিল। মোহিনী বলল, "এবার বুঝেছি। এই সেদিন মাত্র বাবা ঘরের ছাদে একটি নতুন চাদর ঝুলিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুম থেকে জেগে চাদর আর তার জুতা খুঁজে পাননি। এটা তবে নিশ্চয়ই ঐ লালুর কাজ ছিল।"

হঠাৎ আওয়াজ শোনা গেল, "হ্যাঁ, দেবী। ঐ চাদরখানা এখনও আমার সঙ্গে আছে। তবে জুতাগুলো আমার কোন কাজে আসেনি। তোমার বাবার পা ভীষণ বড়।"

রনবীর ও মোহিনী ঘোড়া থামিয়ে অন্ধকারে লালুকে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। রনবীর ডাকল, "কে? লালু নাকি?"

লালু উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ল এবং এগিয়ে এসে ঘোড়ার লাগাম ধরল। বলতে লাগল "আপনি না বলেছিলেন, সব পথঘাটই আপনার চেনা! যদি আমি আগুন না জ্বালাতাম তাহলে কেমন হতো? যাহোক, এখানে ঘোড়া থেকে নেমে যান, সামনের পথ খুব ঢালু।"

রনবীর ও মোহিনী ঘোড়া থেকে নেমে গেল। রনবীর জিজ্ঞাসা করল, "কি লালু, পথে তোমার কোন কষ্ট হয়েছিল?"

লালু বলল, "পথে তো কোন অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এখানে এসে আমি পাঁচুর মৃত্যুর

খবর বলার পর থেকে মাধব, শান্তা আর ওদের মা কেবল কাঁদছেন। এটা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।"

* * * * * *

বুড়ো তেজু ক্লান্তির দরুন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছে। লালু পোষা জন্তুগুলো পাহারা দিচ্ছে। কমল, রনবীর, মোহিনী, মাধব এবং শান্তা অনেকক্ষণ ধরে পাঁচুর মৃত্যুর জন্য দুঃখ করল। কমল পাঁচুর ভালবাসা, ত্যাগ ও বিশ্বস্ততার ঘটনাবলী উল্লেখ করে বারবার ডুকরে উঠতে লাগল। আর রনবীর তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। মোহিনী চুপচাপ বসে আছে। মাধব ঘুনাক্ষরেও আশা করেনি, মোহিনী এভাবে চলে আসতে পারবে। সে কেবল বারবার নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল, "এটা কি বাস্তবিকই সম্ভব? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো!"

এটা তাদের দুঃখ কষ্টের দ্বিতীয় রাত্রি। শান্তা শেষ রাত্রির দিকে একটি পাথরের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। মোহিনীকে ঝিমুতে দেখে কমল তার মাথাটি হাঁটুর ওপর রেখে বলল, "শুয়ে পড় মা!"

সকালে মোহিনী জেগে উঠে কমলকে তার মুখে বারবার চুমো খেতে দেখে দুবাহু দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরে "মা" বলে ডেকে উঠল।

কমলও তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে "আমার সোনার মা" বলে আনন্দাশ্রু ফেলতে লাগল।

মোহিনীরও দু' চোখ থেকে কৃতজ্ঞতার অশ্রু নেমে এলো।

রনবীর ঝরণার কাছে বসে হাত মুখ ধুয়ে নিচ্ছিল। শান্তা ছাগলের দুধ গরম করে একটি বাটিতে ঢেলে নিয়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রনবীর মৃদু হেসে বলল, "আগে মোহিনীকে দাও।"

শান্তা বলল, "মা তাকে আগেই দিয়েছেন।"

রনবীর শান্তার নিকট থেকে বাটি নিয়ে দুধটুকু পান করল। এ দুধের স্বাদ তার কাছে আজ একেবারে অপূর্ব মনে হল।

* * * * * *

কিছুক্ষণ পর রামদাস এসে পৌঁছুল। লালু ছুটে গিয়ে তার ঘোড়ার লাগাম ধরল। মোহিনী ও রনবীর এগিয়ে গিয়ে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তাদের দেখে মাধব এবং শান্তাও তার পদধূলি নিল। রামদাস স্নেহভরা দৃষ্টিতে শান্তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে কমলকে লক্ষ্য করে বলল, "আমাকে তুমি চিনতে পারছ, বোন?"

কমল অশ্রুজড়িত গলায় বলল, "আপনাকে কি করে ভুলতে পারি, দাদা! আপনার কথা জীবনে কেনদিনই ভুলতে পারব না। আপনার শরীর কেমন আছে?"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে রামদাস বলল, "আমি তো ভালই আছি, বোন। কিন্তু তোমাদের জন্য এ জায়গাটা তো নিরাপদ মনে হচ্ছে না, কমল। সামনের ওই উঁচু

পাহাড়টির ওপাশে একটি বস্তি আছে। তোমাদের স্বগোত্রের অনেকে সেখানে বাস করে। আগামীকাল সেখানে তোমরা চলে যেতে পারবে। তোমরা হয়ত পথ চিনবে না। কিছু দূর গেলে কোন রাখাল কিংবা শিকারীর সঙ্গে অবশ্যই তোমাদের দেখা হয়ে যাবে।"

"দাদা! আমি এই পাহাড়ের অলিগলি সব চিনি। তাছাড়া তেজু কাকা ও লালু সঙ্গে রয়েছে। তারা পথঘাট ভাল করেই চেনে।"

তেজু হাত জোড় করে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। রামদাস তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "তুমিও কি এদের সঙ্গে যাবে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ!"

"তাহলে তো খুবই ভাল হয়। দেরী করে কাজ নেই। এক্ষুণি তোমরা রওনা হয়ে যাও। আমিও কিছু দূর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি।"

শান্তা ও মোহিনী একটি ঘোড়ায় সওয়ার হল। মাধব ও রনবীর দু'টি ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। রামদাস কমলকে নিজের পেছনে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল! তেজু ও লালু বোঝা বহনকারী ঘোড়া এবং অন্যান্য পোষা জন্তুগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলল। পথিমধ্যে রামদাস কমলের নিকট থেকে সুখদেব ও কমলের সকল বৃত্তান্ত শুনল। কমল খুবই ব্যথা ভরা কণ্ঠে পাঁচুর সেবা যত্নের কথা বলল।

রামদাস বলল, "বড়ই দুঃখের কথা। তোমরা এত কাছে ছিলে অথচ আমি তার কিছুই জানতে পারিনি। পাঁচুর মৃত্যুর জন্য আমার খুবই আফসোস হচ্ছে। জন্ম মৃত্যুর ওপর মানুষের কোন হাত নেই। সে যাই হোক, এবার কিন্তু আমি রনবীর ও মোহিনীকে তোমার হাতে সঁপে দিতে এসেছি কমল!"

কমলের কোন উত্তর না পেয়ে রামদাস পেছন ফিরে তাকাল। দেখল, সে নীরবে চোখের পানিতে অতীতের সকল দুঃখ ভুলার চেষ্টা করছে।

* * * * * *

দুপুর বেলা ক্ষুদ্র দলটি একটি পাহাড় ডিঙিয়ে নিচের সবুজ উপত্যকায় পৌছে গেল। তারপর একটি ছায়া শীতল স্থানে থেমে তেজু ও লালুর জন্য তারা অপেক্ষা করতে লাগল। মোহিনীর চেহারা দেখে রামদাস তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, " মোহিনী! তোমার জন্য একটি সুখবর আছে। তোমার বাবা আমার নিকট এসেছিল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়েছি। এখন সে আর তোমার ওপর অসন্তুষ্ট নয়। মাধব সুখদেবের পুত্র, একথা সে জানতো না। আমি তার সঙ্গে কথা দিয়েছি যে, খুব শীঘ্রই তোমার মাতা-পিতাকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।"

রামদাস এবার পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলল, "রনবীর! আমাকে তোমার নয়া বাসস্থানের ঠিকানা জানাতে দেরী করোনা, "রনবীর বলল, বাবা, তুমি আমাদের সঙ্গেই চল না?"

মোহিনী বলল, "হ্যাঁ , কাকাবাবু , চলুন।"

মাধব বলল, "খুবই ভাল প্রস্তাব, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা আপনার কোন কষ্ট হতে দেব না।"

শান্তা নীরব ছিল। রামদাস তার দিকে তাকিয়ে বলল, "শান্তা বোধ হয় আমাকে সঙ্গে নিতে চায় না, আর বোধকরি সে জন্যই সে কোন কথাই বলছে না।"

শান্তা শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "বাবা! আপনি যদি আমার কথা মানেন, তাহলে একবার নয়, হাজার বার বলছি, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা আপনার স্নেহ-ছায়ায় পরম সুখেই থাকবো।"

রামদাস বলল, "বাছা! তোমাদের কোন অনুরোধই আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। শীগগীরই আমি তোমাদের কাছে চলে আসছি। যে পর্ণ কুটিরে তুমি ও রনবীর থাকবে, তা আমার নিকট শহরের বড় বড় সুদৃশ্য মহলের তুলনায় অনেক বেশী সুখের হবে। তবে বর্তমান অবস্থায় আমি শহর ছেড়ে আসতে পারছি না। আমি সেখানে থাকার ফলে শত শত মানুষ নির্যাতন থেকে রেহাই পাচ্ছে। হঠাৎ যদি আমি সরে যাই তাহলে গঙ্গারামের মত কোন লোক নগরপতি হয়ে যাবে এবং নিরীহ মানুষের ওপর পুনরায় অত্যাচার শুরু করে দেবে। তাই যতক্ষণ আমি একজন হৃদয়বান ব্যক্তিকে আমার দায়িত্ব অর্পণ করতে না পারবো, ততক্ষণ আমাকে শহরে থাকতেই হবে।"

রনবীর বলল, "বাবা! এসব ঘটনার পর ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয়ই রাজ দরবারে গিয়ে আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করবে। তখন রাজা হয়ত আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার না-ও করতে পারেন। যদিও তিনি আপনাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়ে থাকেন তবু এসময় আমার আশংকা হচ্ছে যে, হিংসুক ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় তিনি হয়ত দিশেহারা হয়ে পড়তে পারেন।"

রামদাস জবাবে বলল, "রাজা সব কিছুই সহ্য করতে পারেন। কিন্তু তাঁর রাজ্যের একটি অংশ চিরতরে হারানো কিছুতেই তিনি মেনে নিতে পারবেন না। তিনি ভালভাবেই জানেন যে, আমি ছাড়া এ শূদ্রদের শান্ত রাখা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। অতীতের যুদ্ধগুলিতে রাজ সৈনিকদের বারবার পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। সেজন্য রাজা খুবই দুঃখিত। সুখদেবের বিরুদ্ধে যারা তাকে ক্ষেপিয়েছিল, তাদের প্রতি রাজা খুবই অসন্তুষ্ট। তিনি মনে করেন, সুখদেবই তাকে ন্যায় পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি তা গ্রহণ না করে ভুল করেছেন। এখন তাই শূদ্রদের প্রতি ন্যায় ও দয়া প্রদর্শনের নীতি তিনি খুবই পছন্দ করেন।"

রামদাস মাধবকে বলল, "বাবা মাধব! আমি তোমার সম্পর্কে খুবই নৈরাশ্যজনক মনোভাব পোষণ করি। স্বপ্নের সুমধুর দৃশ্য যাদের অন্তরকে পরিতুষ্ট করে রাখে, তারা নিজের বা অপরের কোনই কল্যাণ করতে পারে না। সমাজের বিভেদ সৃষ্টিকারী আইন কানুন তোষামোদের দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না। দুনিয়া একটি রাজপথ। বহু জাতি এ পথ ধরে যাত্রা করেছে। ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। এ পথে প্রতিটি জাতিকেই প্রতিপদে গভীর খাদ, ঘন অন্ধকার ও ভয়ানক ঝড় তুফানের সম্মুখীন হতে হয়। এ

পথের সকল যাত্রীই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চায়। কেউ পেছনে পড়ে থাকা পছন্দ করে না। এ কঠোর প্রতিযোগিতার মুখে যারা মাঝ পথে খাদ দেখে নিরুদ্যম হয়ে যায় না বরং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে অন্ধকার ও ঝড়-তুফানের বিরুদ্ধে লড়ে যায়, শুধু তারাই সফলতা অর্জন করতে পারে। পথিমধ্যে খাদ দেখে যাদের পা শিথিল হয়ে পড়ে, ঝড়-তুফান দেখে যারা অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তারা কখনও বিজয়ী হ'তে পারে না। দ্রুতগামী পথিক কখনও তাদের হাত ধরে সঙ্গে নিয়ে যায় না। বরং পায়ের তলায় তাদের পিষে ফেলে সামনে এগিয়ে যায়। সবাই সামনে এগিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত। পেছনে তাকানোর ফুরসৎ কারো নেই। তাই ইতিহাসে তাদেরই উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা বীর দর্পে সকল বাধাবিপত্তির মাথায় পদাঘাত করে চলার পথ করে নেয়। অন্ধকার খাদে যারা তলিয়ে গেছে, তাদের নাম কে মনে রাখে বল?"

"এ পথে কখনও মুরুভূমি আর কখনও বা মরুদ্যান দেখা যায়। যারা মরূপথের দুঃসহ কষ্টে উদ্যমহারা হয়ে মরূদ্যানের ছায়া ও আরামের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে, ক্রমে তারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে যায়। আর ঐ ফাঁকে পেছনের যাত্রীরা সামনে এগিয়ে যায়। যাবার পথে ঘুমন্ত পথিককে জাগিয়ে দেওয়ারও তারা কোন প্রয়োজন বোধ করে না। বরং ঘুমন্ত পথিককে গোলামীর কঠিন শিকলে বেঁধেই রেখে যায়।"

"তোমার জীবনের উন্মেষ ঘটেছে যে সমাজে, তারা অল্প কাল আগেও গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ ছিল। শত শত বছর আগে যারা অচ্ছুত হয়ে গোলামীর জীবন যাপন করছে তাদের অবস্থা দেখার সুযোগ তোমার হয়নি। তারা শক্তিশালীদের লাঠিকে আইনের শেষ দফা মনে করে। যদি তাদের বল যে, তাদের এবং উঁচু জাতের লোকদের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই, তাহলে তারা চমকে উঠে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। যদি তাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে বল, তাহলে তারা তোমাকে উন্মাদ মনে করবে। যদি তুমি তাদের বল ভগবানের দৃষ্টিতে উঁচু নীচু বলে কোন ভেদাভেদ নাই, তাহলে তারা তোমাকে পাপী মনে করবে। শাসক গোষ্ঠীর আইন তাদের ধর্ম। তাই স্বাধীনতার সকল প্রচেষ্টাকে তারা ধর্মের বিরোধিতা বিবেচনা করে। ধর্মই যাদেরকে নীচ ও হীন হয়ে বাস করতে শিক্ষা দেয়, তাদের জাগিয়ে তোলা খুবই কঠিন। তবু আমি তোমাকে নিরাশ হতে বলবো না। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বহু জাতি উন্নতির শীর্ষস্থান থেকে অধঃপতিত হয়ে পতনের গভীর খাদে নেমে গেছে। আবার গভীর খাদের ভিতর থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেও বহুজাতি উন্নতির শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পেরেছে। যারা নিজেদের অধিকার অর্জন করতে দৃঢ় সংকল্প তাদের ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য কারো নেই। তোমাদের মানবীয় অধিকার ছিনিয়ে নেয়ার দরুন তাদের সে অধিকার ফিরে পাবার জন্য তোমরা সংগ্রাম করছ কোথায়? তোমাদের দাবী তাদের মন্দিরে গিয়ে পূজা করতে পারা, তাদের শহরে যাতায়াত করা এবং তাদের পূজা পার্বণে অংশীদার হওয়া। ডাকাত যদি কারো বাড়ী দখল করে নিয়ে বাড়ীর মালিককে

অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী করে রাখে, তাহলে সে ব্যক্তি কি তার বাড়ী ও স্বাধীনতার জন্য লড়বে, না অন্ধকার কুঠরীতে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য ডাকাতের নিকট আবেদন জানাবে? ডাকাত তার বাড়ী ও সকল ধন-সম্পদ দখল করে নিয়ে তাকে বন্দী করেছে। এখন হাতের বাঁধন একটু শিথিল করে দেয়া অথবা সামান্য কিছু খাদ্য ও পানীয় দান করার দরুন ডাকাতকে দেবতা মনে করা কত বড় নির্বুদ্ধিতা। তোমার স্বগোত্রীয়দের আজ অনুভূতি পর্যন্ত নেই যে, তারা বর্ণ-হিন্দুদের চালাকিতে গোলামীর জীবন যাপন করছে।"

"মাধব! আত্মভোলা জাতিকে জাগিয়ে তোলা খুব কঠিন কাজ। তোমার পিতা একজন বীর পুরুষ ছিলেন। তার মনে ছিল গগনচুম্বী উচ্চাকাংখা। আমার মনে হয়েছিল, পতিত জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্যই ভগবান তাকে সৃষ্টি করেছেন। এদেশে এক সর্বাত্মক বিপ্লব সৃষ্টি করার যোগ্যতা তার ছিল। কিন্তু তিনি বিপদ-আপদের ঘূর্ণিপাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন। অত্যাচারিত মানব গোষ্ঠীর জন্য তার মনে ছিল অপরিসীম দরদ। তাদের তিনি ভালবাসতেন, কিন্তু তাদের পক্ষ হয়ে তিনি বুকটান করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারেননি। যদি বোন কমল নারাজ না হন, তাহলে আমি বলব, তোমার মাতার সংসর্গই তাকে বৈরাগীর জীবন যাপন করতে প্রেরণা দেয়। যে ভাবে তার জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল কমল, তেমনিভাবে তোমারও একমাত্র কাম্যবস্তু হচ্ছে মোহিনী। মোহিনীর বেশী এ সমাজের কাছে তুমি কিছুই চাও না। তুমি এখন যাদের নিকট যাচ্ছ, তারা স্বাধীন জীবন যাপন করছে। সেখানে যাবার পর উঁচু জাতের লোকদের শহর ও মন্দিরে যাবার খেয়াল তোমার মনে থাকবে না। মোহিনীকে লাভ করার পর আর তোমার মূর্তি গড়ার প্রয়োজনও রইল না। তা বলে নিজেকে স্বাধীন মনে করে তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়ো, তাহলে জেনে রাখ এ নিদ্রা চিরসুখের কখনও হতে পারে না। গঙ্গারামের মত কোন নিষ্ঠুর সেনাপতি এতদঞ্চলে কোন দিন পৌঁছে যাবে এবং স্বাধীন লোকদের গলায় সে গোলামীর শিকল পরিয়ে দেবে।"

মাধব এতক্ষণ মাথা নত করে রামদাসের বক্তৃতা শুনছিল। এবার সে বলল, "আমার মনে হয় আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি ভীরু কাপুরুষ নই। সুখনিদ্রায় মগ্ন হয়ে অগণিত মজলুম মানুষকে ভুলে যাবার মনোভাব আমি পোষণ করি না। অধঃপতিত জাতিকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে আমার দৃষ্টিভংগী ভিন্নরূপ। আমি শক্তিমানের এ অধিকার স্বীকার করি না যে, তার ইচ্ছা মাফিক দুর্বলকে গোলামী করতে বাধ্য করবে। এ দুনিয়ায় শক্তির অন্ধ আইন চলুক এটা আমি চাই না। আমি ন্যায়নীতি চাই। অত্যাচার মানুষকে হিংস্র জন্তুতে পরিণত করে এবং তার ফলে দুই শ্রেণীর লোক পরস্পরের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরিণামে জালিম মজলুমের স্থান দখল করে নেয়। আমি যেমন দুর্বলদের বাধ্যতামূলক গোলামীর বিরোধী তেমনি শক্তিমানের জন্মগত কর্তৃত্বের অধিকারও মানি না। আমি ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য লড়ব। যতদিন মানব সমাজে একে অপরের প্রভু অথবা দাস হিসাবে পরিচিত না হয়, মানুষে মানুষে

ছোঁয়া–ছুঁয়ির বিধি–নিষেধ মিটে গিয়ে যতদিন না মানুষকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়, ততদিন পর্যন্ত আমার সংগ্রাম আপোশহীন ভাবে চলবে।"

রামদাস বলল, "বাবা! এটা তোমার স্বপ্ন। দুনিয়ার কোন দেশেই তোমার ঐ কল্পিত সমাজের অস্তিত্ব নেই। যদি কোন মানুষ ঐ ধরণের সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প ঘোষণা করে, তাহলে দুনিয়ার সকল দুষ্ট প্রকৃতির লোক তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। দুনিয়ার সকল মানুষকে সত্যিকারভাবে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আকাংখা পোষণ করা আর তা বাস্তবায়িত করা এক কথা নয়, মাধব।"

মাধব জবাবে বলল, "দুনিয়ায় কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকা তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার যুক্তি নয়। গুহায় যারা বাস করতো তারা আলো বাতাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ঘাস পাতার সাহায্যে ঘর তৈরী করেছে। এ ঘর যখন বৃষ্টি বাদল ও ঝড় তুফান থেকে মানুষকে নিরাপত্তা দানে ব্যর্থ হয়েছে, তখন মানুষ মাটি ও পাথরের সাহায্যে মজবুত ঘর তৈরী করতে বাধ্য হয়েছে। প্রয়োজনের অনুভূতিই কর্মের প্রেরণা যোগায়। আজ দুনিয়ায় সব চাইতে বড় প্রয়োজন হচ্ছে শান্তির। শক্তিমানদের জুলুমই মানুষকে ন্যায়ের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে। আমি স্বীকার করি, মজলুম মানুষই সাধরণভাবে এ জাতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। এটাও সত্য যে, মানুষের হাড়–মাংসের উপর দেবতাগিরি প্রতিষ্ঠাভিলাষী অসৎ প্রকৃতির মানুষেরা ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করবে না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সত্য ও ন্যায়ের করাত সকল অসত্য ও অন্যায়ের লৌহ শিকল কেটে ছিন্নভিন্ন করে দেবেই। সেই সমাজ ব্যবস্থাই জয়ী হবে, যে সমাজের ভগবান সকল মানুষকে একই চোখে দেখেন। যার মন্দিরে সকল মানুষের জন্য থাকবে অবাধ প্রবেশাধিকার। সেখানে কোন মানুষই অস্পৃশ্য বিবেচিত হবে না। সে দিন বেশী দূরে নয়, যে দিন মানুষ তার বংশ কৌলিন্যে পরিচিত না হয়ে চরিত্র ও কার্যকলাপের দ্বারা পরিচিত হবে। শক্তিমানের লাঠি সেদিন ন্যায়ের খুরধার তরবারির সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হবে। যদি সে দিন পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি, তাহলে ঐ সৈন্যদলে আমিও একজন সৈনিক হিসাবে শামিল হব। তখন দুনিয়া দেখতে পাবে যে, আমি কাপুরুষ নই।"

রামদাস বলল, "ভগবান করুন, সে দিন যেন অতি দ্রুত আসে! সেদিন আমিও তোমাদের পক্ষে যোগদান করব। কিন্তু যদি কেউ ঐ কল্পিত সমাজের ঝান্ডা উত্তোলন না করে?"

মাধব বলল, "রাতের আঁধারে যার হাতে মশাল নেই, সে পথ চলবে কি করে? তার জন্য তো সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। আমিও অরুণোদয়ের প্রতীক্ষা করতে থাকব।

রামদাস মৃদু হেসে বলল, "হ্যাঁ, তাহলে উষাগমের পূর্বে শহর ও মন্দিরের দিকে পা বাড়াবেন। এটাই আমার শেষ উপদেশ।

রামদাস রনবীরকে লক্ষ্য করে বলল, "আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে, বাবা! বোন

কমলকে তুমি নিজের 'মা' মনে করবে। শান্তার মনে কোন কষ্ট দিবে না। মাধবকে নিজের ভাই হিসাবে মানবে। আর মাধব! তোমাকে একথা বলে যাবার দরকার মনে করছি না যে, মোহিনীর যত্ন নেবে। বোন, কমল! আমাদের সমাজের কোন পুরোহিতই এদের বিয়েতে যেগদান করতে রাজী হবে না। তারা এ বিষয়টি সম্পর্কে কিছুই জানতে না পারাটাই ভাল মনে করি। পনর দিন পর রনবীরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেবে। আমি তার সঙ্গে চলে আসব। মোহিনী! তোমার মাতাপিতাকেও সঙ্গে নিয়ে আসব।"

মোহিনী ও শান্তার মুখমন্ডল লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। রনবীর ও মাধবের চেহারায় আনন্দের চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট। কমলের চোখের কোণ থেকে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। রামদাস ঘোড়ায় চড়ে আর একবার সকলের মুখের দিকে মমতাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিদায়নিল।

* * * * * *

আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে উড়ে চলছে মেঘমলা। রামদাস একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ঘোড়া থামিয়ে দিল। তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, তার পুত্র ও পুত্রবধু সহকারে ছোট দলটি উপত্যকার শেষ প্রান্তে পৌছে একটি পাহাড়ী পথ বেয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। রামদাস অনেক সময় পর্যন্ত তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঐ দলটি পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে সে ঘোড়াটিকে নীচের দিকে ছুটিয়ে দিল।

তার মস্তিষ্কে তখন নানারকম চিন্তা উঠানামা করছে। কল্পনার চোখে রামদাস দেখতে পেল, দূর পাহাড়ের গায়ে উঁচু দেবদারু গাছের ছায়ায় একটি ছোট্ট কুটিরে রনবীর ও শান্তা বসে। আর স্বয়ং রামদাস তাদের মধ্যস্থলে। শান্তার কোলে একটি ছোট্ট শিশু হাত দু'খানা নাচিয়ে খেলা করছে। শান্তা যেন বলছে, যাও তোমার দাদাঠাকুরের কোলে। রামদাস তুলতুলে নরম শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। শিশুটি খল খল করে হেসে উঠল। সে তার নরম দু'খানি হাত দিয়ে রামদাসের লম্বা গোঁফ টেনে ধরল। রামদাস পরম স্নেহে শিশুটির হাতে ও পায়ে চুমো খাচ্ছে।

একচল্লিশ

রামদাস এখন বাড়ীর পথে চলেছে। তাঁর মনে নানাবিধ চিন্তার মৃদু মৃদু ঢেউ খেলে যাচ্ছে। ভগবানের ধর্ম কি করে এত হিংসার প্রশ্রয় দিতে পারে, তা সে কিছুতেই বুঝে

উঠতে পারছে না। একমাত্র পুত্রকে বনবাসী করে আজ রামদাস রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরে যাচ্ছে। অথচ রনবীর কোন পাপ করেছে বলে তার বিশ্বাস হয় না। সুখদেবের কন্যা শান্তাকে ভালবেসে রনবীর গুণের সমাদর করেছে মাত্র। তবু আজ সে সমাজচ্যুত। মোহিনীর মাতাপিতাই বা কি করে এ বিচ্ছেদের জ্বালা সহ্য করবে? অথচ মোহিনী সুখদেবের পুত্র মাধবকে ভালবেসে কোন অপরাধ করেনি। তথাপি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের দৌরাত্ম্যে তাদের দেশ ত্যাগ করতে হল। ভগবানের সৃষ্ট অগণিত মানুষ বন-জংগলে পশুর মত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। ভগবানের ধর্মই তাদের মানুষের মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয়। অথচ উঁচু বা নীচু সমাজে জন্ম নেয়া কারো নিজের ইচ্ছাধীন নয়। তবু উঁচু জাতের মানুষ তথাকথিত অচ্ছুৎদের দু' চোখে দেখতে পারে না। মানুষে মানুষে এ হিংসা, বিদ্বেষ ও বৈষম্য ভগবান শিখিয়েছেন বলে রামদাস কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। মনে মনে তাই সে প্রার্থনা করল, ভগবান! তুমি এ বিভেদ দূর কর। মানুষকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত কর। সমাজে হিংসার পরিবর্তে ভালবাসা ও সম্প্রীতি এনে দাও।

যৌবনপুরে প্রবেশ করে রামদাস অনুভব করল সর্বত্রই যেন একটা ভয় ও নৈরাশ্য বিরাজ করছে। কারো মুখে হাসি নেই। দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে রামদাস নিজ বাড়ীতে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে লোকজন এসে জড়ো হতে লাগল। তাদের চোখ মুখ ম্লান। সমগ্র নগরটিতে কে যেন বিষাদের ছায়া বিস্তার করে দিয়েছে।

অর্জ্জুন এসে বলল, "খবর খুবই খারাপ। মুসলমানদের এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী রাজধানীতে এসে হামলা চালিয়েছে। আমাদের রাজ চক্রবর্তী নিহত হয়েছেন। নবাগত মুসলিম সৈন্যবাহিনী রাজধানী দখল করে নিয়েছে।"

"এ খবর কে নিয়ে এলো?"

"রাজধানী থেকে মুসলমান সেনাপতির চিঠি নিয়ে একজন দূত এসেছে। সে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চিঠিখানা আপনার হাতেই দিতে চায়।"

"কোথায় সে দূত?"

"আমাদের অতিথিশালায় বিশ্রাম করছে। সে এক অদ্ভুত মানুষ। এ শহরের সৈন্য ও পুলিশদের কিছুমাত্র পরোয়া না করে সে একা এখানে চলে এসেছে। অতিথিশালার বিছানাপত্র কিছুই ব্যবহার করছে না। তার নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে সে মেঝের উপর শুয়ে থাকে, সঙ্গে নিয়ে আসা শুক্‌নো রুটি ও ফলমূল খায়, পুকুর থেকে হাত পা ধূয়ে এসে পশ্চিমমুখী হয়ে নামাজ পড়ে।"

রামদাস কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। অতিথিশালা থেকে অপেক্ষমান দূতকে নিয়ে আসার জন্য ইতিপূর্বেই লোক পাঠানো হয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই একজন দীর্ঘকায় গৌরববর্ণ স্বাস্থ্যবান যুবক বৈঠকখানায় প্রবেশ করল। রামদাস দাঁড়িয়ে তাকে সম্বর্ধনা জানাল। যুবক জিজ্ঞেস করল, "আপনিই কি রামদাস?"

রামদাস সম্মতিসূচক জবাব দিলে যুবক তার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে আসন

গ্রহণ করল।"

রামদাস চিঠিখানা খুলে পড়তে শুরু করল।

"বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আমি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালার এক নগণ্য বান্দাহ্ আপনাকে জানাচ্ছি যে, আপনাদের রাজচক্রবর্তী মানুষের প্রতি জুলুম ও অবিচারের শাসন কায়েম করে রেখেছিলেন। তাকে ঐ ব্যবস্থা সংশোধন করার আহবান জানানোর জবাবে তিনি লড়তে চেয়েছিলেন। সুমহান আল্লাহর অপার করুণায় রাজচক্রবর্তীর বিপুল সংখ্যক অত্যাচারী সৈন্য পরাজয় বরণ করেছে এবং রাজা নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়েছেন। মুষ্টিমেয় পুরোহিত ও পূজারী ছাড়া জনসাধারণ এ অত্যাচারী শাসকের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে আজ আনন্দ প্রকাশ করছে।

আপনি ও আপনার অধীনস্থ সকলকেই ইসলামের শান্তিপূর্ণ দ্বীন কবুল করার জন্য আহবান জানাচ্ছি। যদি তা না করেন, তাহলে ইছলামী শাসনাধীনে নিরাপদে জিম্মি নাগরিক হিসাবে বসবাস করার পূর্ণ সুযোগ আপনাদের রয়েছে। আপনাদের সকলের জান-প্রাণ, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত সম্ভ্রমের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। নিজেদের ধর্ম পালনে আপনাদের কোন বাধা দেয়া হবে না। শুধু বৈষম্যমূলক শাসনকার্য থেকে আপনাদের সরে থাকতে হবে। এ দুটোর মধ্যে যে কোন পথ গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদেরয়েছে।

এরপরেও যদি আপনারা সকল সুযোগ-সুবিধা পরিত্যাগ করে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমরাও আপনাদের সম্মুখীন হতে বাধ্য হব। তখন দেখতে পাবেন যে, আল্লাহর বান্দারা মৃত্যুকে মোটেই ভয় করে না। আর ঐ যুদ্ধে লোকক্ষয় ছাড়া আপনাদের কোনই ফায়দা হবে না। কারণ সত্য সমাগত ও মিথ্যা অপসারিত। অসত্য ও অন্যায় মিটে যাবেই। সত্যের জয় অবধারিত।

আমার প্রেরিত দূতের সঙ্গে এখানে এসে আপনি দেখা করেও যেতে পারেন। আপনাকে সসম্মানে নিয়ে আসা হবে এবং সাক্ষাতের পর নিরাপদে নিজের বাড়ীতে পৌঁছেদেয়াহবে।

আল্লাহ্তায়ালার এক নগণ্য গোলাম

মুহাম্মদ জালালুদ্দিন।

রামদাস চিঠিখানা পড়া শেষ করে দূতের মুখের দিকে তাকাল। তাঁর সুন্দর চেহারায় ঘনকালো দাড়ি। মাথায় পাগড়ী, কোমরে তরবারি ঝুলছে। মিষ্টি হাসিখানা যেন মুখে লেগেই রয়েছে। দূত জিজ্ঞেস করল, "পড়া শেষ হয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি ভাবছেন?"

"দু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?"

"করুন"

"আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?"

"সুদূর আরব থেকে আমাদের কাফেলা আল্লাহর বাণী বহন করে দেশ বিদেশে বের হয়ে গেছে। আমরাও এদেশে ইছলামের দাওয়াত নিয়ে এসেছি। আমাদের নিকট খবর পৌছল যে, সিলেটে জনৈক অত্যাচারী রাজা আল্লাহর বান্দাদের ওপর চরম জুলুম করছে। এই খবর শুনে আমরা কতিপয় নিরস্ত্র ধর্ম প্রচারক এখানে এসে পৌছেছি।"

"আপনাদের ধর্মের বাণী কি?"

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মনিব, মালিক উপাস্য ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী নেই। আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁরই বাণীবাহক।

"একথার তাৎপর্য কি?"

"সমগ্র বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক ও একমাত্র মনিব হচ্ছেন আল্লাহতায়ালা, মানুষের উপর মানুষের কোন কর্তৃত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সকল মানুষই তাঁর সৃষ্ট এবং তারা পরস্পর ভাই ভাই। মানুষ শুধু আল্লাহকেই বড় মনে করবে, কোন মানুষকে নয়। মানুষ শুধু তাঁরই আদেশ নিষেধ মেনে চলবে, অন্য কারো নয়। মানুষ শুধু তাঁরই নিকটে মাথা নত করবে, অন্য কারো নিকটে নয়। আর হজরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) যে ভাবে জীবন পরিচালনা করতে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সে ভাবেই জীবন যাপন করার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানব জাতিরকল্যাণ।

রামদাসের মনে হল, এ যেন এক নতুন কথা নতুন পথ। অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে আসছে নতুন সূর্যের আলোক রেখা। রামদাস বলল, "আমি আপনাদের রাজার সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"তাহলে আপনি আমার সঙ্গে চলুন। আমাদের কোন রাজা নেই। আমাদেরই মত আল্লাহর একজন বান্দাহ আমাদের আমীর বা আদেশদাতা। তাঁর সঙ্গে সকলেই অবাধে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে।"

রামদাস জিজ্ঞেস করল, "আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসা পর্যন্ত এ শহরের শাসন কে চালাবে?"

"আপনি যে কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিয়ে যেতে পারেন।"

রামদাস অর্জ্জুনকে পুনরায় শহরের দায়িত্ব অর্পণ করে সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের শান্ত ভাবে তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার নির্দেশ দিল। পরদিন দু'জন সিপাহী সঙ্গে নিয়ে রামদাস দূতের সঙ্গেই সিলেট শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

বিয়াল্লিশ

শহরের নিকটবর্তী হেতেই রামদাস অনুভব করল, সমগ্র পরিবেশটাই যেন বদলে গেছে। শূদ্রসহ সকল উপজাতীয় লোকজন অবাধে শহরে প্রবেশ করছে। আবার অনেকে ফিরেও আসছে। কোথাও হিংসা বিদ্বেষের চিহ্ন মাত্র নেই। যুদ্ধে পরাজিত জাতির মনে বিজয়ীদের সম্পর্কে যে ভয়-ভীতি থাকে, তার লেশমাত্র নেই। সবাই খুশী। রাজ চক্রবর্তীর পরাজয়টা কারোর কাছেই যেন দুঃখজনক হয়ে ওঠেনি।

রামদাসের সঙ্গে কিছু সংখ্যক পরিচিত লোকেরও দেখা হল। তারা সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে। রামদাসের প্রশ্নের জবাবে তারা বলল, "এতদিন আমরা অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবেছিলাম। এবার সত্যিকার সুখ, শান্তির সন্ধান পেয়েছি। আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আপনাকেও এ মহান ধর্ম গ্রহণ করার শক্তি দান করেন।"

শহরের সর্বত্রই মানুষ অবাধে চলাফেরা করছে। কোথাও মুসলিম সৈনিকদের টহল দিতে অথবা নাগরিকদের হয়রানি করতে দেখা গেল না। পাগড়ী, কোর্তা ও পাজামা পরা যে সব মুসলমানদের সঙ্গে পথে দেখা হল, তাদের খুবই ভদ্র, শিষ্ট ও সাদাসিদা মানুষ মনে হল। তারা রামদাসের সঙ্গী দূতকে "আসস্লামু আলাইকুম" বলে শুভেচ্ছা জানাল। রামদাস সঙ্গীকে প্রশ্ন করে এটার অর্থ ও উদ্দেশ্য জেনে নিল। তার নিকট এ ব্যবস্থাটাও খুব ভাল মনে হল।

আম্বর খানার নিকটস্থ একটি উঁচু টিলার নিচে গাছপালার ছায়া ঘেরা একটি স্থানে বহুলোক জমায়েত হয়েছিল। রামদাসকে নিয়ে দূত টিলার উপরে একটি তাঁবুতে পৌছল। সেখানে চাটাই বিছিয়ে কয়েকজন লোক বসে কথা বলছিলেন। দূত সেখানে পৌছে "আসস্লামু আলাইকুম" বলল, "ওয়া আলাইকুমুসস্লাম" বলে যিনি জবাব দিলেন তিনি উপবিষ্টদের মধ্যে সব চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ। সুন্দর চেহারা থেকে যেন আলোর জ্যোতি বের হয়ে আসছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল। মাথায় সুন্দর করে চিরুনী করা বাবরি চুল। গায়ে লম্বা কোর্তা। পরিধানে একখানা সাধারণ লুঙ্গী। তিনি বললেন, "আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, ভাই আবদুল্লাহ্?"

"যৌবনপুর গিয়েছিলাম। সেই শহরের নগরপতি রামদাস আমার সঙ্গে রয়েছেন।"

"তাঁকে নিয়ে আসুন।"

আবদুল্লাহর ইঙ্গিতে রামদাস তাঁবুতে প্রবেশ করে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে আমীরের উদ্দেশ্যে সালাম করল। আমীর সাহেব এগিয়ে এসে তাকে হাত ধরে চাটাইয়ের উপর

বসালেন। তাঁবুতে আমীরের সঙ্গে যারা এতক্ষণ কথাবার্তা বলছিলেন, তারা অন্য তাঁবুতে চলেগেলেন।

আমীর পরম দরদ ও ভালবাসা নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কেমন আছেন?"

"ভগবানের কৃপায় ভালই আছি।"

"যৌবনপুরের অবস্থা কি?"

"এখন স্বাভাবিক। প্রথম প্রথম কিছুটা ভয়-ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, আগে বিজয়ীগণ পরাজিতদের সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করতো। আপনার দূতের কথাবার্তা শুনে ও চালচলন দেখে সবাই আশ্বস্ত হয়েছে। আমি ফিরে যাবার পর নগরবাসী আমার মতামত শোনার পরই আমরা কর্তব্য স্থির করবো।"

"আপনি কোন্ বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছেন?"

"আমি জানতে এসেছি, আপনাদের পররাজ্য দখল করার উদ্দেশ্য কি?"

"আমরা কারো রাজ্য দখল করতে আসিনি। মানুষের উপর শাসন দন্ড কায়েম করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেননা, শাসন করা আল্লাহ্ তায়ালারই এখতিয়ারভূক্ত। আমরা আল্লাহ্র দ্বীনের বাণী প্রচার করে বেড়াই। মানুষকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে এনে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেই। কোন অত্যাচারী শাসক যদি দেশবাসীর উপর নির্যাতনমূলক শাসন চালায়, তাকেও আমরা ঐ কাজ থেকে বিরত করার চেষ্টা করি। যদি সে জুলুমের পথ পরিত্যাগ করতে অস্বীকার করে তাহলে তাকে অপসারণ করা ছাড়া উপায় কি?"

"আপনাদের ধর্মানুসারে এ রাজ্যে অমুসলিমদের কি কি নিরাপত্তা দেওয়া হয়?"

"তারা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে। তাদের ধন-সম্পদ ও মান-ইজ্জতের পূর্ণ হেফাজত করা হবে। তবে যেহেতু তারা জুলুম মূলক শাসন চালায়, এ জন্য তাদের শাসন করতে দেয়া হবে না।"

"আপনাদের নিকট কি অমুসলিমরা অপবিত্র? তাদের স্পর্শ করতে আপনাদের ধর্মে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?"

"সকল মানুষই আল্লাহ্র সৃষ্ট। তাদের দেহ কখনও অপবিত্র হতে পারে না। তারা যদি অন্যায় ও অসত্য পথে জীবন যাপন করে তাহলে তাদের সে নীতি পরিত্যাজ্য। তারা নিজেরা ত্যাজ্য নয়। যে মুহূর্তে তারা অন্যায় নীতি ত্যাগ করবে, সে মুহূর্তেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।"

"যেসব লোক চাষী, রজক, চর্মকার, কর্মকার ইত্যাদি পেশা গ্রহণ করেছে, তাদের মান-মর্যাদা সম্পর্কে আপনাদের ধর্ম কি বলে?"

"আমাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা নেই। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হলে বিভিন্ন পেশার লোক দরকার। বিশেষ পেশা গ্রহণ করার দরুন মানুষের মান-মর্যাদা কমে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে সকলেই সমান। অবশ্য পরকালে সৎ লোকদের পুরস্কৃত করা হবে আর অন্যায়কারীদের দেয়া হবে শাস্তি।"

"আল্লাহ্ এবং ভগবান কি অভিন্ন নয়?"

"আল্লাহ, ঈশ্বর বা ভগবান ইত্যাদি শব্দের পার্থক্যটা তেমন কিছু নয়। তবে আপনারা যাকে ঈশ্বর বা ভগবান বলেন তাঁর স্ত্রী পুত্রাদি আছে ভাবা হয়। তাই তিনি মানবীয় দূর্বলতার উর্ধে নন। পক্ষান্তরে আল্লাহ্তায়ালার স্ত্রী পুত্র বা কন্যা হবার যোগ্যতা কোন সৃষ্টির নেই। সৃষ্টি স্রষ্টার সমকক্ষ হবে কি করে? নিরাকার সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে এরূপ নিকট সম্পর্ক কল্পনা করা তাঁর বিশালত্বকে খর্ব করা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"আমি দিন দুয়েক এখানে থাকতে চাই। অনুমতি পাব কি?"

"অবশ্যই। আমাদের মেহমানখানায় অমুসলিমদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ রয়েছে। ব্রাহ্মণ পাচকেরা সেখাণে রান্না ও খাবার পরিবেশন করে। আপনি স্বচ্ছন্দে সেখানে থাকতেপারেন।"

আমীরের ইঙ্গিতে আবদুল্লাহ্ রামদাস ও তাঁর দুইজন সিপাইকে মেহমানখানায় নিয়ে গেল। রামদাস কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর জোহরের নামাজের আযান হলে মুসলমানরা ঐ সময় কি কি করে তা দেখার জন্য সেখানকার মনার টিলার দিকে রওনা হল। সবুজ মাঠে লোকজন পশ্চিমুখী হয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। আমীর সাহেব এসে সকলের সম্মুখভাগে দাঁড়ানোর পর নামাজ শুরু হয়ে গেল। রামদাস অবাক বিস্ময়ে দেখতে পেল, সকল মুসলমানই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাজের জন্য দাঁড়িয়েছে। উচ্চ–নীচ, ছোট–বড়, ধনী–দরিদ্র সকলে মিলে একটি মাত্র দলে পরিণত হয়েছে। কারো প্রতি কারো বিদ্বেষ নেই। কেউ অপরকে উপাসনায় যোগ দিতে বাধা দিচ্ছে ন। সকলে একযোগে একজন মাত্র নেতার অনুসরণ করে মহান আল্লাহ্র উপাসনা করছে। কি সুন্দর সে দৃশ্য! সাম্য, মৈত্রী ও সমানাধিকারের এমন বাস্তব দৃশ্য ইতিপূর্বে কখনও সে দেখতে পায়নি। রামদাসের মহারাজাকে যেসব সৈনিক যুদ্ধে পরাজিত করেছেন, তাঁরাও এ দলে রয়েছেন। আবার যারা সবেমাত্র ইসলাম কবুল করেছেন, তাঁরাও আছেন। তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মহান আল্লাহর দরবারে এসে সকল মুমীন ভাই ভাই হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। নামাজ শেষে আমীরের সঙ্গে হাত উঠিয়ে স্রষ্টার দরগায় তাদের অপরাধ ও দোষত্রুটির জন্য তারা ক্ষমা প্রার্থনা করল। এ অপূর্ব দৃশ্য রামদাসের মনে গভীর রেখাপাতকরল।

নামাজের পর আমীর সাহেব নিজের জায়গাতেই ঘুরে বসলেন। নামাজীদের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লোক একের পর এক নিজেদের নানাবিধ অনুবিধার বিষয় আমীরকে জ্ঞাত করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এসব অসুবিধার প্রতিকার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন। মাঠের এক পার্শ্বে বহু অমুসলিম দাঁড়িয়ে ছিল। আমীর তাদের নিকটে আসার জন্য ইশারা করলে তারা সবাই ছুটে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,"আপনারা কি কিছু বলতে চান?"

জনৈক হিন্দু চাষী করজোড়ে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করল যে, মৃত রাজা ঐ চাষীর পুত্রকে বিনা অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করলে, সে এখনও তার পুত্রের কোন সন্ধান

পায়নি। আমীর কারাগারের ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে কয়েদীর পরিচয় জেনে নিয়ে তাঁকে মুক্তি দেয়ার নির্দেশ দিলেন।

একজন শূদ্র বলল, "আমার বাড়ী নদীর ঐ পাড়ে। রাজার সৈনিকেরা বিনা কারণে আমার বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে গরু বাছুর লুটপাট করে নিয়ে গিয়েছে। দু'বছর যাবৎ তাই আমি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমীর বললেন, "আপনার বাড়ী তৈরী করে দেয়া হবে এবং লুণ্ঠিত পশুগুলির জায়গায় নতুন পশু ক্রয় করার জন্য আর্থিক সাহায্যও দেয়া হবে।"

এক বৃদ্ধা মেথরাণী বুক চাপড়ে চীৎকার করতে করতে আসছে আর বলছে, "বাবাজী জালাল কোথায়? আমি তার কাছে বিচার চাই।" আমীর তাকে দেখেই পরম মমতা সহকারে বললেন,তাকে আমার কাছে পৌছিয়ে দাও। কর্তব্যরত ব্যবস্থাপকগণ বুড়ীর হাত ধরে তাকে আমীরের নিকটে নিয়ে এলো। বুড়ী বলল, "তুমিই নাকি বাবা জালাল!"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ মা! বলো তোমার কি সাহায্য দরকার?"

বুড়ী বলল, আমার এক ছেলে ও এক মেয়েকে রাজা গোবিন্দ হত্যা করেছে। আমি তার বিচার চাই। তাদের অপরাধ তারা ভগবানের প্রশংসা করে গান গাইছিল। রাজার সৈনিকেরা শুনতে পেয়ে তাদের ধরে নিয়ে যায়। তারপর রাজা তাদের মুখে গলানো সীসা ঢেলে দেয়ার আদেশ দেয়। আমার আর কোন সন্তান নেই। তুমি বাবা দয়ার সাগর। এ অন্যায়ের বিচার কর।

আমীর জালালুদ্দিন বললেন, "মা, তোমার সন্তান তো আর ফিরে আসবে না, আমরা সবাই তোমার সন্তান। সরকারী তহবিল থেকে তোমার সকল খরচপত্র বহন করা হবে। আর তোমার দেখাশুনা করার ব্যবস্থাও আমি করব।"

বুড়ী বলল, "তুমি মানুষ নও বাবা! সাক্ষাৎ দেবতা!"

আমীর বললেন, "না, না, এমন কথা বলোনা, মা। আল্লাহ্ নারাজ হয়ে যাবেন।"

পার্শ্বে দাঁড়ানো এক হিন্দু শিক্ষক বলে উঠল, "আপনি যেমন দরদ ও ভালবাসা প্রকাশ করছেন, তা শুধু দেবতাদের নিকটই আশা করা যায়।"

আমীর বললেন, "আমি একজন সাধারণ মানুষ। আল্লাহ্ তায়ালার এক অতি নগণ্য গোলাম। আমি আল্লাহ্রই হুকুম মুতাবিক সবকিছু করছি। তিনি রহমানুর রাহীম। তাঁর সৃষ্টিকে তিনি যে কত ভলবাসেন তার পরিমাণ নির্ণয় করা অসম্ভব। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যই আমি তাঁরই সৃষ্ট মানুষের সেবা করার সামান্য প্রয়াস পাচ্ছি মাত্র।"

এ সময় রামদাস দন্ডায়মান হলে আমীর বললেন, "হ্যাঁ, বলুন, আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?"

রামদাস বলল, "আমার বিশ্বাস আপনি ভগবানের বিশেষ দূত। আপনাকে যারা দেবতার সঙ্গে তুলনা করছে তারা নেহায়েৎ ভুল করছে। দেবতা কখনও মানুষকে

ভলবাসার শিক্ষা দেয়নি। দেবতা তো মানুষে মানুষে বিভেদের প্রাচীর খাড়া করেছে মাত্র। আমার বিবেচনায় দেবতার চেয়ে মানুষই বড়। আর আপনি হচ্ছেন সত্যিকার মানুষ।"

আমীর সাহেব বলরেন, "ব্যক্তির কোনই কৃতিত্ব নেই। স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালাই তাঁর সৃষ্ট মানুষকে ভালবাসার আদেশ দিয়েছেন। দেবতা হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মানুষ কখনও দেবতা হতে পারে না। জ্ঞান ও চরিত্রে উন্নত হলে তিনি আদর্শ স্থানীয় মানুষ হতে পারেন,. দেবতা নয়। আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির পথ প্রদর্শক হয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনিও মানুষ। তাঁকেও দেবতা মনে করা পাপ।"

রামদাস এই সব দেখে শুনে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দিল। আমীর তাকে সাদরে ইসলামের সুশীতল আশ্রয়ে আহ্বান জানালেন। রামদাস ইসলাম গ্রহণ করলে তার নামকরণ করা হল আবদুর রহমান। তার সঙ্গী সিপাই দু'জনও দীক্ষা গহণ করল। তারপর উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে বহু অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল। আবদুর রহমানের অনুরোধে আমীর মুহাম্মদ জালালুদ্দিন যৌবনপুরে ইসলাম গ্রহণেচ্ছুদের শিক্ষাদানের জন্য জনৈক আলেমকে আবদুর রহমানের সঙ্গে সেখানে যাবার নির্দেশ দিলেন এবং আবদুর রহমানকেই সে শহরের নগরপতির পদে বহাল করলেন। আবদুর রহমান আরও দুদিন আমীরের সংসর্গে রইলো এবং জরুরী অনেক কিছু শিখে নিয়ে যৌবনপুরের উদ্দেশ্যে একদিন রওনা দিল।

তেতাল্লিশ

আবদুর রহমান যৌবনপুরে পৌছলে অপেক্ষমান নগরবাসী তার বেশভূষার পরিবর্তন দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। অর্জ্জুন তার পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করার জন্য এগিয়ে এলো না। নগরপতির বিশাল বাড়ীতে জনসাধারণ ছুটে এসে জড় হতে লাগল। কিন্তু তাদের মনে দ্বিধা সংকোচ। নগরপতি ভিন্ন ধর্মাবলম্বন করেছে। পুরোহিত ঠাকুর ইতিমধ্যেই প্রচার করেছে যে, রামদাস ম্লেচ্ছ হয়ে গেছে। ম্লেচ্ছ মুসলমান অচ্ছুৎদের চাইতেও বেশী অপবিত্র। অবশ্য প্রচারণা চালাতে হয়েছে খুবই গোপনে। কারণ রাজ চক্রবর্তীর পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাদের অবস্থা খুবই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

নগরপতির বাড়ীর সামনে যে খোলা চত্বরটি রয়েছে তাতে শহরের লোকেরা জড় হলে আবদুর রহমান তাদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় বললঃ

আমার নগরবাসী ভাইয়েরা,

আমি আপনাদের জন্য এক সুসংবাদ বহন করে এনেছি। রাজ চক্রবর্তী যাদের হাতে পরাজিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তারা কারো শত্রু নন। বরং তারা মানবতার পরম বন্ধু ও শুভাকাংখী। তাদের পক্ষ থেকে কোন অত্যাচারের আশংকা নেই। রাজধানী শহরে বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করছে। অবস্থা দেখে মনেই হয় না যে, সেখানে কখনো কোন যুদ্ধ হয়েছে। শহরের অধিবাসীদের মনে ভয়-ভীতির পরিবর্তে আনন্দ দেখা দিয়েছে। কারণ, তারা নবাগতদের নিকট অত্যন্ত মধুর ব্যবহার ও ন্যায় বিচার পাচ্ছে। সকল দীন-দুঃখী লোকদের তালিকা তৈরী করে তাদের আয় রোজগারের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে-তা আমি নিজ চোখেই দেখে এলাম। এ তালিকা প্রণয়ন কালে ধর্ম-গোত্র বা বর্ণের ভিত্তিতে কোন তারতম্য করা হয়নি। বিজয়ী বীরদের পরিচালক সংসারাসক্ত রাজা বা সম্রাট নন। তিনি এক তাপস ব্যক্তি, তাঁর সঙ্গে আগত যোদ্ধাদের সকলেই এক একজন সাধক। তারা সারা দিন মানুষকে আল্লাহর মধুর বাণী শোনান, সৎভাবে জীবনযাপন করার শিক্ষা দেন। আবার নামাজের বিছানায় দাঁড়িয়ে মহান আল্লাহর নিকট অনিচ্ছাকৃত দোষত্রুটিগুলোর জন্য ক্ষমা চান। সে সময় তাদের চোখের কোণ থেকে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা। ইসলামের নিখুঁত ধর্ম বিধান এবং মুসলমানদের চরিত্র মাধুর্যে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তাই নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পন করে ঐ মহান লোকদের দলে শামিল হয়েছি। আমীর সাহেব আমাকে নগরপতির পদে বহাল রেখেছেন। আপনাদের উপর কোন চাপ নেই। যারা ইচ্ছা করেন, তারা ইসলাম কবুল করে নিতে পারেন। আমাদের শিক্ষদানের জন্য একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি কষ্ট স্বীকার করে এখানে এসেছেন এবং কিছুকাল থাকবেন। যারা পৈতৃক ধর্মে থাকতে ইচ্ছুক, তারা অবাধে নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারবেন। কিন্তু আইন ও শসন চলবে আল্লাহ্‌র। আজ থেকে কেউ অস্পৃশ্য বিবেচিত হবে না। শূদ্রদেরও শহরে বসবাস ও যাতায়াত করার পূর্ণ অধিকার থাকবে। কেউ তাদের এ অধিকারে বাধা দিতে পারবে না। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বৈধ উপায়ে আয়-উপার্জন করার সকলেরই সমানধিকার থাকবে। কারো সম্পত্তিতে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নিজ নিজ উপাসনালয়ে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীগণের পূজা-পার্বনের অধিকারও থাকবে। কেউ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে বাধা-দানের অধিকার কারো নেই। আমি আবার বলছি, আসুন আমরা সকলে মিলে আল্লাহ্‌র দেওয়া দীন ইসলাম গ্রহণ করে ইহকাল ও পরকালের সুখ শান্তির পথ খোলাসা করি। যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করবে না, তারা শান্তি প্রিয় ও আইনানুগত নাগরিক হিসেবে বসবাস করুন। হিংসা, চক্রান্ত, পরের সম্পদ অপহরণ ও মানুষকে হেয় করে রাখার অপচেষ্টাকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়াহবে।"

বক্তৃতা শেষে আবদুর রহমান আসন গ্রহণ করল পুরোহিত ঠাকুর দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আমাদের মন্দির ও পূজার্চ্চনার নিরাপত্তা থাকবে তো?"

আবদুর রহমান বলল, "সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। কারো ধর্ম পালনে বাধা দেয়া হবে না। কেবল মাত্র ধর্ম পালনের নামে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ অথবা তাদের ধর্মকার্যে বাধাদান করা চলবে না।"

পুরোহিত পুনরায় বলল, "মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমরা কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেই ন। আমাদের সে অধিকার বহাল থাকবে কি?"

আবদুর রহমান বলল, "যাদের মন্দির তারা যাদের বাধা দিবে তারা ঐ মন্দিরে যেতে পারবে না। কিন্তু যাদের বাধা দেয়া হবে, তারা যদি পৃথক মন্দির স্থাপন করতে চায়, তাহলেও কেউ তাদের মানা করতে পারবে না।"

পুরোহিত ঠাকুরের মুখখানা শুকিয়ে গেল। সে শংকরকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। তাদের সঙ্গে আরও কিছু লোক উঠে গেল। এদিকে অর্জ্জুন ঘোষণা করল, "আমার বাল্যবন্ধু রামদাসকে আমি চিরদিনই বিচক্ষণ ও ন্যায়নিষ্ঠ মনে করি। তাঁর মুখ থেকে পবিত্র ইসলামের বিষয়ে যা যা শুনতে পেলাম, তা আমাকে ঐ ধর্ম গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত। কিভাবে গ্রহণ করবো তা আমাকে শিখিয়ে দেয়ার জন্য আমি তাকে অনুরোধ করছি।"

চারদিক থেকে আওয়াজ উঠলো, "আমরাও মানবধর্ম ইসলাম গ্রহণ করব।"

আমীরের প্রেরিত আলেম সাহেব সকলকে কালেমায়ে শাহাদাত পড়িয়ে দিলেন এবং ঐদিন থেকেই তাদের ইসলামের জরুরী বিষয়গুলোর শিক্ষা দেয়ার জন্য রীতিমত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হল। পুরুষদের নির্দেশ দেয়া হল যে, তারা ঐ প্রতিষ্ঠানে যা' যা' শিখবে, বাড়ীতে ফিরে গিয়ে স্ত্রীলোকদের তা শেখাবে। পরের দিন শহরের নিকটের বস্তিগুলো থেকে অগণিত নর-নারী ও ছেলেমেয়ে শহরে এসে ইসলাম কবুল করতে শুরু করল।

যুগ যুগ ধরে যারা ছিল অস্পৃশ্য, লাঞ্ছিত ও পদদলিত তারা আজ মুক্তির সন্ধান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। যে আল্লাহ তাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, যিনি তাদের ঘৃণ্য জীবন যাপন থেকে উদ্ধার করার জন্য এক মহান মুক্তিদাতাকে পাঠিয়েছেন, সেই নিরাকার ও সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশে সিজদা করে তারা পরম তৃপ্তিলাভ করল। তাদের সকল অভাব মিটে গেল। "দেবতাদের" সমাজ ছেড়ে তারা মানুষের সমাজে মিশে হারানো মর্যাদা ফিরে পেল। এ সমাজে কেউ কারো দাস নয়, সবাই একমাত্র আল্লাহর দাস এবং সকলে পরস্পরের ভাই। সাম্যের মহান বাণী যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত সকল গ্লানি ধূয়ে মুছে দিয়ে এক পবিত্র ও ভেদাভেদহীন সমাজের জন্মদান করল। অবশ্য পুরুত ঠাকুর, শংকর ও মুষ্টিমেয় কিছু লোক প্রাচীন ধর্ম আঁকড়ে রইল। এদিকে যৌবনপুরের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়ে নতুন জৌলুসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

চুয়াল্লিশ

রামদাসেরই উপদেশ অনুসারে কমল দলবলসহ পূর্বদিগের একটি পাহাড় অতিক্রম করে উপত্যকার অপর পার্শ্বের পাহাড়ে গিয়েপৌছুল। উঁচু নীচু গাছপালা ও টিলা সমন্বিত এ পাহাড়ের স্থানে স্থানে অনেকগুলো ছোট ছোট কুটির দেখা যায়। অনেকগুলো পোষা ভেড়া, বকরী ও গাধা সেখানে চরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়টির উত্তর প্রান্তে বেশ একটা সমতল জায়গা দেখে কমল বলল, আমাদের থাকার জায়গা করলে ভাল হয়। ভারবাহী পশুগুলোকে দাঁড় করিয়ে তেজু ও লালু মালপত্র নামাতে শুরু করল। ঝোপ-ঝাড়ের ভিতরের ছোট ছোট কুটিরগুলো থেকে পুরুষ, নারী ও ছেলেমেয়েরা ছুটাছুটি করে নবাগত দলটিকে দেখতে এলো। বয়স্কদের অনেকেই তেজুকে চিন্‌তে পেরে কুশল বার্তাদি বিনিময় করল। তার নিকট সাধন সরদারের কন্যা কমলের এবং সুখদেবের ছেলে মাধব ও কন্যা শান্তার পরিচয় পেয়ে তারা সকলেই কুটির তৈরীর সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে লেগে গেল। মেয়েরা তাদের কুটির থেকে নানাবিধ ফল মূল নিয়ে এসে নবাগতদের খাবার ব্যবস্থা করল। পাহাড়ের নীচেই একটি ঝরনা ছিল। লালু কলসী ভরে সেখান থেকে পানি নিয়ে এলো। সন্ধ্যার আগেই চারখানা ঘর তৈরী হয়ে গেল। শান্তা ও মোহিনী দু'জনে মিলে বিকালের খাবার তৈরী করে ফেলল। লালু ইতিমধ্যেই কয়েকটি বনমোরগ এবং একটি হরিণ শিকার করে এনেছিল। রাত্রিবেলা খাবার পর পরিবারে সকলে ঘরের সামনে খোলা জায়গায় বসল। পাহাড়ী বাসিন্দারাও গল্প গুজব করতে এলো। তেজু তাদেরকে সকল বৃত্তান্ত জানাল। তাদের মধ্য থেকে জগু নামক জনৈক বৃদ্ধ বলল, "তেজু ভাই! আমাদের কোন সরদার নেই। আমি তোমাদের মধ্যে সব চাইতে বেশী বয়সের মানুষ। সেজন্য সকলে আমাকে সরদার বলে মানে। অবশ্য আমাকে কেউ কোন দিন সরদারের দায়িত্ব দেয়নি। যৌবনপুর থেকে পালিয়ে আসার সময় আমারই পরিচালনায় যারা এখানে এসেছিল, তারা স্বাভাবিক ভাবেই আমারই উপদেশ ও পরামর্শে সকল কাজ করতে থাকে। আমি অন্য কোন যোগ্য লোকের অবর্তমানে এদের আদেশ উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে সাধন সরদারের কন্যা কমল এসেছে। আমার প্রস্তাব কমলই এখন থেকে আমাদের এ গ্রামের নেত্রী হবেন।"

কমল বলল, "জগু কাকা! আমি তোমার সন্তান তুল্য। আমাকে তোমার এসব বিষয়ের সঙ্গে জড়িত করোনা না। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে আমার মন মগজ এখন

আর সুস্থ নেই।"

জগু বলল, "তাহলে বাচ্ছা! সুখদেবের পুত্র মাধবকে আমরা সরদার মনোনীত করতে পারি?

মাধব বলে উঠল, "কি বলছেন জগু দাদা! আমি নেহায়েত ছেলে মানুষ। আমার তো এখনও বুদ্ধিশুদ্ধিই হয়নি।"

অপর একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি নিতাই বলল, "মাধব! সুখদেবও ছেলে মানুষই ছিল। কিন্তু তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও চরিত্র উন্নত ছিল। আমরা আজও তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তুমি তারই ছেলে। আমরা তোমাকে সুখদেবেরই মত গুণজ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাসকরি।"

মাধব বলল, "যদি তোমরা আমার কথার কোন মূল্য দিতে রাজী থাক, তাহলে আমি একজন যোগ্য লোকের নাম প্রস্তাব করতে পারি।"

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার কথা মেনে নিতে আমাদের কোনই আপত্তিনেই।"

মাধব বলল, "তোমরা বোধহয় শুনতে পেয়েছ যে, যৌবনপুর বর্তমানে একটি বড় শহরে পরিণত হয়েছে এবং ঐ শহরের নগরপতি হচ্ছেন আমার বাবার বন্ধু রামদাস। তিনিই একসময় আমার মাতা ও পিতাকে রাজার কারাগার থেকে উদ্ধার করেছিলেন। নগরপতি হয়ে তিনিই শূদ্রদের প্রতি অত্যাচারের আইন রদ করেছেন। এখন আর রাজার সৈন্যদল শূদ্রদের বাড়ী-ঘর জ্বালাতে ও লুটপাট করতে আসে না। সেই রামদাসেরই একমাত্র পুত্র রনবীর নিজেদের সমাজ ছেড়ে আমাদের সমাজে চলে এসেছেন। তিনি নগরপতির তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হয়েছেন বিধায় তার জ্ঞান আমার চাইতে অনেক বেশী। তাছাড়া, তিনি সাহসী, বিচক্ষণ ও হৃদয়বান। তোমরা আমাকে সরদার মনোনয়নের দায়িত্ব দিয়েছ। আর আমি ঘোষণা করছি যে, রনবীরই আজ থেকে আমাদের সরদার হোক।"

রনবীর আপত্তি করে কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু সমবেত আনন্দ ধ্বনিতে তার স্বর চাপা পড়ে গেল।

ততক্ষণে উপস্থিত নরনারী সকলেই রনবীরের নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেছে। লালু কোথা থেকে ছুটে এসে হরেক রকম বনফুল দিয়ে গাঁথা মালা তার গলায় পরিয়ে দিল।

মাধব ও তেজু সকলকে শান্ত করে বলল, "সরদার কিছু বলতে চায়। আমাদের তার কথা শোনা উচিত।"

উপস্থিত সকলে নীরব হলে রনবীর বলতে শুরু করল, "উপস্থিত ভাইসব! তোমরা সকলে মিলে যা সিদ্ধান্ত করবে, তা মানতে আমার আপত্তি নেই। তবে দু'টো বিষয়ের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমতঃ আমি তোমাদের সম্প্রদায়ের লোক নই। আমি এমন এক সমাজ থেকে এসেছি, যেখানে তোমাদের মানুষ বিবেচনা করা

হয় না। আমাকে আগে তোমাদের সঙ্গে মিশে যেতে দাও। দ্বিতীয়তঃ আমার বয়স নিতান্ত কম। তোমরা অনেকেই আমার বাবার বয়সের লোক। তোমাদের জ্ঞানবুদ্ধি আমার চেয়ে অনেক বেশী। এমতাবস্থায় আমি কি করে তোমাদের নেতৃত্বের দায়িত্বভার নিতেপারি।

জগু বলল, "আমরা সব কথা জেনে শুনেই তোমাকে আমাদের সরদার মনোনীত করেছি। সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হবে না। সকলেই বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই আমাদের সরদার। আমরা কোন ওজর আপত্তি শুনবো ন।"

কমল বলল, "জগু কাকা! তোমাদের সরদার নির্বাচন শেষ হল। এবার আমার একটা কথা শুন। আমার একমাত্র কন্যা শান্তাকে আমি রনবীরের হাতে সমর্পণ করব। আর আমার একমাত্র পুত্র সন্তান মাধবেরও বিয়ে দেব। কনে আমার সঙ্গেই নিয়ে এসেছি। তোমরা কাল সবাই আসবে। নিমন্ত্রণ রইল। সবাই আবার আনন্দ ধ্বনি করল। তারপর সে রাতের মত সকলে যার যার কুটিরে চলে গেল।

পরদিন সকালেই গ্রামের যুবক ছেলেরা শিকারে বের হয়ে গেল এবং সামান্য বেলা উঠার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি হরিণ ও পাখী শিকার করে নিয়ে এলো। ওদিকে মেয়েরা রান্নার লেগে গেল। দুপুরে সকলে হাসি খুশী সহকারে ভুনা গোশ্ত ও ভাত রুটি মিলিয়ে বিয়ের ভোজপর্ব সমাধা করল। অপরাহ্নে পুনরায় গ্রামের সকল পুরুষ, নারী ও ছেলেমেয়েরা সরদারের বাড়ীর পার্শ্বে জমায়েত হল। কমল মোহিনীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে এক পার্শ্বে ঘাসের তৈরী একটি চাটাইয়ে বসিয়ে দিল। তারপর মাধবকে তার পার্শ্বে বসিয়ে বলল, "মাধব! মোহিনী উঁচু জাতের মেয়ে। মাতা-পিতার একমাত্র আদরের দুলালী! সে তোমারই জন্য মাতাপিতাকে ছেড়ে এই জংগলে চলে এসেছে। আমি ভগবানকে সাক্ষী করে এ মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। বল, তুমি তার মর্যাদা রক্ষা করবে?"

মাধব কম্পিত কণ্ঠে বলল, "মা। আমি ভগবানকে সাক্ষী করে বলছি! মোহিনীকে আমি কখনও অমর্যাদা করবো না।"

কমল মোহিনীর ডান হাত খানি মাধবের হাতে তুলে দিলে মাধব তার হাত ধরে নিয়ে কুটিরে চলে গেল। এবার কমল শান্তাকে একই ভাবে নিয়ে এসে রনবীরের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "ভগবানকে সাক্ষী করে আমি শান্তাকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি।"

রনবীরও তার হাত ধরে বলল, "মা! ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি কখনো শান্তার মর্যাদা হানি করব না।"

পয়তাল্লিশ

অর্জ্জুনের নতুন নামকরণ করা হয়েছে আবদুর রহীম। যৌবনপুরের বাসিন্দাগণ নয়া ব্যবস্থা মুতাবিক জীবন-যাপনে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠলে আবদুর রহমান ও আবদুর রহীম চারজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হল। বর্তমানে জাহানারা নামে পরিচিত সাবিত্রীও তাদের সঙ্গে চলল। সেলিম নামক জনৈক নবদীক্ষিত শিক্ষিত যুবকের উপর নগরপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হল। দু'দিন ঘোড়ার পিঠে কাটানোর পর দূরের একটি পাহাড়ের এক প্রান্তে কয়েকটি কুটির দেখা গেল। কিন্তু পাহাড়ী পথে ঘুরাঘুরি করে সেখানে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। কুটিরগুলোর নিকটবর্তী হতেই জন কয়েক পাহাড়ী যুবক তাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলল, "তোমরা কে, কোথা হতে, কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ?"

আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের সরদারের নাম কি?"

তারা বলল, "রনবীর"

আবদুর রহামন বলল, "আমরা তোমাদের সরদারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

এ সময় একটি ছেলে নিকটে এসে বলে উঠল, "আপনাকে তো আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে হয়। কিন্তু এ ধরণের কাপড়-চোপড় পরা লোক তো আগে দেখিনি। গলার স্বর হুবহু সরদারের বাবার মত। কিন্তু তাঁর পোশাক তো এরূপ ছিল না। তিনি যৌবনপুরের নগরপতি।"

আবদুর রহমান নিকটে গিয়ে ছেলেটির মাথায় হাত দিয়ে বলল, "তুমি দেখছি লালু! আমিই যৌবনপুরের নগরপতি। চিন্‌তে পারছ না? পোশাকটা বদলী করেছি মাত্র।"

লালু উচ্চস্বরে বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি।"

সে ঘোড়ার বাগ ধরে বলল, "নেমে আসুন।"

চারদিকে যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও এসে অন্যান্য অতিথিদের ঘোড়া ধরল। এদিকে গোলমাল শুনে রনবীর বিষয়টা কি দেখতে এলো। বিস্ময়াভিভূত হয়ে, "বাবা!" বলে আবদুর রহমানের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। ওদিকে লালু হৈ হুল্লোড় করে কমল, মাধব, শান্তা, মোহিনী সকলকে অতিথিরদের আগমনের খবর জানিয়ে দিল। অতিথিরা কুটিরের দিকে যাচ্ছিল আর ওদিক থেকে কমল, মাধব, মোহিনী, শান্তা তাদের দিকে ছুটে এলো। মোহিনী মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আনন্দ অশ্রু ফেলতে লাগল। মা বাবা দু'জনকেই এক সঙ্গে পেয়ে তার আজ আনন্দের সীমা নেই। অশ্রু ঢেলেই সে তার আনন্দ প্রকাশ করল।

কুটিরের নিকট গেলে মশাল জ্বালিয়ে দেয়া হল এবং খোলা উঠানে ঘাসের তৈরী চাটাই বিছিয়ে সকলেই তার ওপর বসে পড়ল। খবর জানাজানি হতেই পার্শ্বের টিলা ও ঝোপঝাড় থেকে দলে দলে নরনারী ও ছেলেমেয়ে অতিথিদের দেখতে এলো।

কমল বলল, "দাদা! আপনারা তো সারাদিন কিছু খাননি সামান্য একটু বসে গল্প-গুজব করুন, আমি তাড়াতাড়ি কিছু খাবার তৈরী করে আনি।"

আবদুর রহমান ব্যস্ত হয়ে বলল, "না, না, আমরা খেয়েছি। আমাদের সঙ্গে এখনও

যথেষ্ট খাবার রয়েছে। সেজন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, বোন।"

আবদুর রহমান, আবদুর রহীম, জাহানারা একের পর এক রনবীর, মাধব, শান্তা, মোহিনী, লালু, তেজু প্রমুখের কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করল। তাদের নিকটে বসিয়ে বার বার তারা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। রনবীর বলল, "বাবা! একটা কথা জিজ্ঞেস করতে বার বার ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের অসন্তুষ্টির ভয়ে বলতে পারছি না।"

ভয় কি? নিঃসংকোচে বল। কেউ অসন্তুষ্ট হবে না। সবকিছু বলা এবং শোনার জন্যই তো এসেছি।"

"আপনাদের সকলেরই বেশ ভূষায় আশ্চর্য ধরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।"

"শুধু বেশ ভূষায় নয়! আমাদের মন মগজ ও জীবন ধারা সবই পাল্টে গেছে বাবা। আমরা নতুন মানুষ হয়ে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। বলতে এসেছি যে, তোমাদের আর এ অজ্ঞাতবাসে থাকার প্রয়োজন নেই।"

'সব কথা খুলে বলুন, বাবা! আমরা সবাই আপনাদের কথা শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়েঠেছি।"

"রনবীর! বহুদিন থেকে আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী ধর্ম ভগবানের ধর্ম হতে পারে না। বিপুল সংখ্যক মানুষ মুষ্টিমেয় উচ্চ বর্ণের লোকদের দাসত্ব করেও মানুষ হিসাবে বিবেচিত হবে না– এটা চরম নিষ্ঠুরতা। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূজাপার্বনে অনিচ্ছা সহকারে অংশ নিচ্ছিলাম। কারণ, এ ধর্মের অসারতা সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। সুখদেবকে যেদিন প্রাণদন্ড দেয়া হয় এবং কমলকে তাঁর চিতায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত হয়, সেদিন আমার মন দৃঢ়ভাবে বলে ওঠে, এ ধর্ম ন্যায় নীতি বর্জিত জিনিষ। প্রস্তর ও মাটির দেবতা তৈরী করে ভগবানের নামে মানুষের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে মাত্র। আমি তাই বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সেদিন সুখদেব ও কমলকে মুক্ত করে দেই। রাজ চক্রবর্তী গোবিন্দজীও অত্যন্ত উদার হৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু পুরত পূজারীদের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস তাঁর ছিল না। শূদ্রদের বশ করার জন্য তিনি যখন আমাকে দায়িত্ব দেন, তখন আমি বলেছিলাম কোন নিষ্ঠুর আচরণ আমার দ্বারা সম্ভবপর হবে না। তিনি আমাকে আমার অভিরুচি মোতাবেক কাজ করার পূর্ণ অধিকার দেন। আমি শূদ্রদের সঙ্গে মানবসুলভ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। অবশ্য ধর্মের অনুশাসন মেনে যতটুকু করা সম্ভব।"

"নিয়তির এমনি অদ্ভুত লীলা। সুখদেবেরই সন্তানেরা আবার ধর্মীয় বিধি–নিষেধের রশি ধরে টান্ মারল। সমাজের ভয়ে আমি এবং মোহিনীর মাতাপিতা প্রাণপ্রিয় সন্তানদের বনবাসী হয়ে যেতে অনুমতি দিলাম। আমি নিজে এসে তোমাদের এখানে রেখে ফিরে যাবার পথে শুধুই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছিলাম, তিনি যেন সত্য প্রকাশ করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, এ ধর্ম–মানব সৃষ্ট ধর্ম। ধর্মের অনুশাসন রচনাকারীগণ সমাজের ঘাড়ে নিজেদের চাপিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই এসব ব্যবস্থা তৈরী করে রেখেছে। ভগবানের ধর্ম হবে সকল মানুষের জন্য।"

বাড়ী ফিরে গিয়ে জানতে পেলাম, "ইসলামের শান্তির পতাকা আমাদের রাজ্যের মধ্যেই উড্ডীন হয়েছে। আরব দেশের মক্কা নগরীতে হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ

আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামে আল্লাহর এক প্রেরিত পুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালা। তিনিই মানুষ ও সকল জীবের অন্নদাতা ও প্রতিপালক। তিনিই একমাত্র মালিক, মনিব ও উপাস্য। মানুষ শুধু তাঁরই কাছে মাথা নত করবে, তাঁরই হুকুম মাফিক চলবে এবং তাঁকে ভয় করে জীবন যাপন করবে। সকল মানুষই আল্লাহর সৃষ্ট। তাই মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে না। রক্ত, বর্ণ ও গোত্রের বিভিন্নতার দরুন মানুষ অপর মানুষের তুলনায় বড় কিংবা ছোট হয় না। যারা আল্লাহতায়ালাকে মেনে চলে ও সৎভাবে জীবন যাপন করে, তারাই উত্তম মানুষ। আর যারা তাঁকে অমান্য করে, তারা অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য। যারা হজরতের এ ঘোষণা মুতাবিক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, তারা মুসলমান তারা আল্লাহর অনুগত বলে পরিচিত হয়। আর যারা অমান্য করে তাদের বলা হয় কাফের। এ মহান ধর্মের অনুসরণকারী মুসলমান ভাইয়েরা দুনিয়ায় মানুষকে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েন। তাদেরই একদল আমাদের রাজ্যেও এসে পৌঁছে গেছেন। আমাদের সাবেক রাজা গোবিন্দজী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। কিন্তু বিজয়ীদল পরাজিতদের প্রতি কোন অত্যাচার করেননি। বরং দরদ, ভালবাসা ও মমতা দিয়ে সকলকেই কাছে টেনে নিয়েছেন। আমরা সে ধর্ম গ্রহণ করে শান্তির পথ খুঁজে পেয়েছি।"

কমল বলল, "দাদা! আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন বহুদিন থেকে এই সত্য জিনিসটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আমার মন বলছে, স্রষ্টার ধর্ম কখনও মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে না। মানুষ মানুষের ভাই। আর একমাত্র স্রষ্টাই তাদের মনিব। একথা আমি বহুদিন থেকে মনে মনে বিশ্বাস করে আসছি। আপনি আমাকেও ঐ মহান ধর্মে শামিল করে নিন্।"

মাধব বলল, "বাবা! আমি একদা এক ভগবানের মূর্তি তৈরী করেছিলাম। ঐ মূর্তিকে আমি নিরাকার, নিরপেক্ষ, দয়ালু ও সদাজাগ্রত ভগবানরূপে কল্পনা করেছিলাম। আমি তাঁর মন্দির স্থাপন করে সকলের জন্য সে মন্দির উন্মুক্ত করে দেয়ার কথাও ভাবতাম। পাঁচু কাকা আমাকে সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, নিরাকার, নিরপেক্ষ ও দয়ালু স্রষ্টার মূর্তি তৈরী করার কোন দরকার নেই। তাঁর সৃষ্ট আকাশ–বাতাস, গাছ–পালা, নদী–পাহাড় তাঁরই মহিমা প্রচার করছে। এসব নিদর্শন দেখে তার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করাই যথেষ্ট। কোন দেবমূর্তি গড়ার প্রয়োজন নেই। পাঁচু কাকার উপদেশে আমি ঐ মূর্তি পূজা থেকে বিরত হয়েছিলাম। আজ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমার কল্পনার ভগবানই আল্লাহরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং মক্কার সেই মহাপুরুষের মুখ দিয়ে নিজের পরিচয় জানিয়ে দিয়েছেন। বাবা! আমিও মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত দূতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম।"

রনবীর গভীর মনোযোগ সহকারে আলোচনা শুনছিল। সে এবার বলল, "বাবা! আপনি জানেন, আমি মাধব, শান্তা, তেজু, লালু ও পাঁচুকে মানুষ বিবেচনা করে এসেছি। কিন্তু আমাদের ধর্ম তাদের মর্যাদা স্বীকার করে না। তাই এ ধর্মই ছেড়ে আমি মানবতাকে সম্বল করে বনবাসী হয়েছি। আজ আপনার নিকট মানব ধর্মের সন্ধান পেলাম! বাবা! আমি পূর্ব থেকেই মনে মনে এ ধর্মের অনুসারী হয়ে আছি। আমিও আজ

থেকে মুসলমান।"

মোহিনী মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। জাহানারা স্নেহের কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কন্যাকে দেখে যেন তার মনের আশ মিটছে না। এবার মোহিনী কথা বলল। সে আবদুর রহমানকে লক্ষ্য করেই বলল, "কাকা! আজ আমার বড়ই খুশীর দিন। আজ সবাইকে আমি এক সঙ্গে পেয়েছি। সেদিন আপনাদের সকলকে ছেড়ে আসার সময় ভেবেছিলাম, হয়ত চিরজীবনের জন্যই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েগেল। যে আল্লাহর দয়ায় আজ আমরা পুনরায় মিলিত হ'চ্ছি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একমাত্র উপায়ই হচ্ছে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করা। মায়ের নিকট থেকে আমি ইতিমধ্যেই অনেক কিছু জেনে নিয়েছি। আমি আপনাদের সকলকে সাক্ষী রেখে বলছি, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুলাহ্।"-

উপস্থিত অন্যান্যদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণের সংকল্প প্রকাশ করল। রাত গভীর হতে দেখে আবদুর রহমানের নেতৃত্বে আবদুর রহীম ও সঙ্গীগণ এশার নামাজ শেষ করে পুনরায় বসল এবং সকলকে কলেমা পড়িয়ে ইছলামে দীক্ষাদান করল। ইসলাম গ্রহণের পর সকলের নাম পরিবর্তন করা হল। কমলের নাম হল জোহরা খাতুন, মাধব মাহবুবুল আলম, রনবীর মুজাহিদুল ইসলাম, শান্তা-আমিনা খাতুন, মোহিনী-হাসিনা খাতুন, তেজু-তাজুল ইসলাম, আর লালুর নাম রাখা হল লুৎফর রহমান।

বস্তির লোকেরা দাবী করল যে, তাদের ছেড়ে মুজাহিদ এবং মাহবুব শহরে চলে যেতে পারবে না। এখানে সরদারের কাজ চালানোর যোগ্য লোক নেই। তাছাড়া ইসলামের শিক্ষাদান করার জন্যও উপযুক্ত লোকের দরকার।

রনবীর বলল, "আমি তোমাদের ছেড়ে কোথাও যাব না ভাই। ইসলামেরই বিষয়ে আরও বেশী জ্ঞান লাভ করে শীগগীর আমি ফিরে আসব এবং তোমাদের সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর জমিনে চারদিকে ঘুরে ফিরে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর বান্দায় পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ভাই হাবিব সরদারের দায়িত্ব পালন করবে। মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাতের পর সভা শেষ হল।

পরের দিন ফজর নামাজের পর আবদুর রহমানের নেতৃত্বে আবদুর রহীম, জাহানারা, জোহরা, আমিনা, হাছিনা, মুজাহিদ এবং মাহবুব শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। বন জংগলের অধিবাসী নবদীক্ষিত মুসলমানেরা তাদের বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বহুদূর পর্যন্ত পেছনে পেছনে এসে এই অভিযাত্রিক দলটিকে সূর্যোদয়ের পথে এগিয়ে দিল।

SCANNED by

"Sotto Kontho"

send books at this address

priyoboi@gmail.com

মানুষ ও দেবতা

নসীম হিজাযী